ISSN-0971-8397

যোজনা

ধনধান্যে

ফেব্রুয়ারি ২০১৫ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ১০

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও ভারতীয় শাসনতন্ত্র

রাজস্ব যুক্তরাষ্ট্রিকতা ও স্থানীয় সরকারের ভূমিকা
এম এ উম্মেন

নীতি আয়োগ ও ভারতের রাজস্ব যুক্তরাষ্ট্রিকতা
নির্বিকার সিং

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তি ও উন্নয়ন
বলবীর অরোরা

বিশেষ নিবন্ধ

বিকাশশীল বাজার এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ
অলক শীল

ফোকাস

ডিজিটাল ভারত কর্মসূচি
যোগেশ কে দ্বিবেদী, নৃপেন্দ্র পি রানা, এন্টনিস সি সিমিনটিরাস
ও
বনিতা লাল

National Litigation Policy

The National Litigation Policy was formulated recently by the Government of India. The policy is based on the recognition that Government and its various agencies are the pre-dominant litigants in courts and Tribunals in the country. Its aim is to transform Government into an Efficient and Responsible litigant and to reduce Government litigation in courts so as to achieve the Goal in the National Legal Mission to reduce average pendency time from 15 years to 3 years. This policy is also based on the recognition that it is the responsibility of the Government to protect the rights of citizens, to respect fundamental rights and those in charge of the conduct of Government litigation should never forget this basic principle.

The Mission Statement

The mission statement further declared that the Government must cease to be a compulsive litigant. The philosophy that matters should be left to the courts for ultimate decision has to be discarded. The easy approach, "Let the court decide," must be eschewed and condemned. Litigators on behalf of Government have to keep in mind the principles incorporated in the National mission for judicial reforms which includes identifying bottlenecks which the Government and its agencies may be concerned with and also removing unnecessary Government cases. Prioritisation in litigation has to be achieved with particular emphasis on welfare legislation, social reform, weaker sections and senior citizens and other categories requiring assistance must be given utmost priority

Stakeholders & Accountability

In ensuring the success of this policy, all stake holders will have to play their part – the Ministry of Law & Justice, Heads of various Departments, Law Officers and Government Counsel, and individual officers all connected with the concerned litigation. The success of this policy will depend on its strict implementation. Nodal Officers will be appointed by Heads of Department. Accountability being the touch-stone of this Policy, it would ensured at various levels; at the level of officers in charge of litigation, those responsible for defending cases, all the lawyers concerned and Nodal Officers. There will be Empowered Committees to monitor the implementation of this Policy and its accountability. Screening Committees for constitution of Panels will be introduced at every level to assess the skills and capabilities of people who are desirous of being on Government Panels before their inclusion on the Panel. Emphasis will be on identifying areas of core competence, domain expertise and areas of specialization.

Implementation of the Mission-Modalities

• Government advocates must be well equipped and provided with adequate infrastructure such as computers, internet links, etc. Common research facilities must be made available for Government lawyers as well as equipment for producing compilations of cases. • Nodal Officers will be responsible for active case management. This will involve constant monitoring of cases particularly to examine whether cases have gone "off track" or have been unnecessarily delayed. • The practice of giving incomplete briefs must be discontinued. The Advocates-on-Record will be held responsible if incomplete briefs are given. • It will be the responsibility of the Nodal Officer to report cases of repeated and unjustified adjournments to the Head of Department and it shall be open to him to call for reasons for the adjournment. The Head of the Agency shall ensure that the Records of the case reflect reasons for adjournment, if these are repeated adjournments. Serious note will be taken of cases of negligence or default and the matter will be dealt with appropriately by referring such cases to the Empowered Committee. If the advocates are at fault, action against them may entail suspension/removal of their names from Government Panels.

Public Interest Litigation

Public Interest Litigations must be approached in a balanced manner. On the one hand, PILs should not be taken as matters of convenience to let the courts do what Government finds inconvenient. It is recognized that the increase in PILs stems from a perception that there is governmental inaction. This perception must be changed.

Pendency

The Office of the Attorney General and the Solicitor General shall also be responsible for reviewing all pending cases and filtering frivolous and vexatious matters from the meritorious ones. Cases will be grouped and categorized. The practice of grouping should be introduced whereby cases should be assigned a particular number of identity according to thesubject and statute involved. To facilitate this process, standard forms must be devised which lawyers have to fill up at the time of filing of cases. Panels will be set up to implement categorization, review such cases to identify cases which can be withdrawn. These include cases which are covered by decisions of courts and cases which are found without merit withdrawn. This must be done in a time bound fashion.

The story of a Man
who became a Mahatma
Read Our Books

Publications Division
Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

e-mail: dpd@sb.nic.in, businesswng@gmail.com
website: publicationsdivision.nic.in
Now on Facebook at www.facebook.com/publicationsdivision

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 10.00

FEBRUARY, 2015
R.N.I. No. 19740/69

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 100/- ☐ 2. yrs. for Rs. 180/- ☐ 3. yrs. for Rs. 250/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

ATTENTION PLEASE

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana - Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, শ্রীমতি সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।

ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সম্পাদনায় : **অন্তরা ঘোষ**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

গ্রাহক মূল্য : ১০০ টাকা (এক বছরে)
১৮০ টাকা (দু-বছরে)
২৫০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় — ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে — ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- রাজস্ব যুক্তরাষ্ট্রিকতা ও স্থানীয় সরকারের ভূমিকা — এম এ উম্মেন — ৫
- নীতি আয়োগ ও ভারতের রাজস্ব যুক্তরাষ্ট্রিকতা — নির্বিকার সিং — ১১
- ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তি ও উন্নয়ন — বলবীর অরোরা — ১৩
- বৈচিত্র্যের উদ্‌যাপন — অ্যাশ নারায়ণ রায় — ১৬
- যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিবর্তন ও ঈশানকোণের প্রসঙ্গ — ড. প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় — ২০
- ভারতীয় শাসনতন্ত্রে স্থানীয় সরকার পঞ্চায়েতিরাজের ব্যাপ্তি ও ভূমিকা — ড. উদয়ভানু ভট্টাচার্য্য — ২৬
- ভারতের সাত দশকের শাসন বিতর্ক : যুক্তরাষ্ট্র বনাম রাজ্যসংঘ — উৎপল চক্রবর্তী — ৩১

বিশেষ নিবন্ধ

- বিকাশশীল বাজার এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ — অলক শীল — ৩৫

ফোকাস

- ডিজিটাল ভারত কর্মসূচি — যোগেশ কে দ্বিবেদী, নৃপেন্দ্র পি রানা, এন্টনিস সি সিমিনটিরাস ও বনিতা লাল — ৩৮

নবপরিকল্পনা

- "কন্যাসন্তানকে বাঁচাও, কন্যাসন্তানকে পড়াও" — ৪২

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা ডায়েরি — সংকলক : দেবাংশু দাশগুপ্ত — ৪৪
- জানেন কি? ফসল বিমা — মলয় ঘোষ — ৫০
- প্রতিযোগিতা প্রস্তুতি (স্বাস্থ্যপরিষেবা ক্ষেত্রে নতুন পেশা) — মহুয়া গিরি — ৫২
- যোজনা ক্যুইজ — পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী — ৫৪

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

বুদ্ধের নির্বাসন

একটি রাষ্ট্রের বহুস্তরীয় সাংগঠনিক নীতি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ধারণাটি বেশ পুরোনো। গ্রিক নগর-রাজ্যে এর প্রচলন ছিল। উত্তর ভারতে খ্রিস্টজন্মের পূর্বে ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিচ্ছোভি রাজত্বে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এর এক সুপ্রসিদ্ধ উদাহরণ। আধুনিক যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, মেক্সিকো ও ভারতের মত বড় বড় দেশে এই ব্যবস্থাই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। আদপে, এরই একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ হল ইউরোপীয় ইউনিয়ন—এ ক্ষেত্রে অবশ্য অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি বহু-রাষ্ট্রীয় (ট্রান্স-ন্যাশনাল) স্তরে প্রয়োগ করা হয়েছে। এটা হয়তো আশ্চর্যজনক বলে মনে হতে পারে যে, ১৯৯০-এর পর প্রায় তিন ডজন নতুন রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে—কোনও বড় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে অপসরণ, যুদ্ধ বা অন্যান্য কারণে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিচালন ব্যবস্থায় ত্রুটি-বিচ্যুতির দরুন দেখা দেয় জাতিগত বিবাদ, যার চরম পরিণতি হিসেবে জন্ম হয় এইসব নতুন রাষ্ট্রের।

পণ্ডিতদের মতে, বিশ্বব্যাপী 'যুক্তরাষ্ট্রীয় আলোড়ন' লক্ষ করা গেলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কোনও একটি নির্দিষ্ট আদর্শ বা ধাঁচ নেই। মঁতেস্ক্যু 'সার্বভৌম নগর-রাজ্য দ্বারা গঠিত সংঘবদ্ধ প্রজাতন্ত্র'-এর কথা বলেছেন। অন্যদিকে জেম্‌স ম্যাডিসনের মতো যুক্তরাষ্ট্রীয়তাবাদীরা 'সংকীর্ণ আঞ্চলিক কায়েমি স্বার্থকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতাসম্পন্ন সর্বশক্তিমান কেন্দ্রীয় সরকার' সহ 'যৌগিক প্রজাতন্ত্র'-এর পক্ষে সওয়াল করেছেন। ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতা বাবাসাহেব আম্বেদকর বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের মতো সাংস্কৃতিক, জাতিগত এবং ভাষাগত বৈচিত্র্যময় একটি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোই 'প্রধান বৈশিষ্ট্য', তবে এর ভিত্তি হতে হবে শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধতা। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন। তবে এই মতবাদের সঙ্গে গান্ধীজির যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সংক্রান্ত ধারণার বিশাল ফারাক ছিল। গান্ধীজি বিকেন্দ্রীকরণ ও পঞ্চায়েতের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত ক্ষমতা-হস্তান্তরের সমর্থক ছিলেন।

যোজনা

বিশ্বায়নও গভীরভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ধারণাকে প্রভাবিত করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ক্রমশ যত সুসংহত হবে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিদেশি শক্তির জোরালো প্রভাবে রাজ্যগুলির স্বাধীনতা ততই ব্যাহত হবে। এটা প্রায়ই সরকারি প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। এর ফলে আবির্ভাব হয় 'প্রতিযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো', যেখানে বিনিয়োগ, মূলধন ও প্রযুক্তির জন্য আঞ্চলিক সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অন্যদিকে, ভারত ধীরে ধীরে আর্থিক বিষয়ে রাজ্যের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে এবং শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের নীতি সংক্রান্ত ক্ষেত্রেই ক্রমশ নিজের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রেখে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পথে এগিয়ে চলেছে। তক্কিভিলের মতানুসারে যুক্তি দেওয়া যেতেই পারে যে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোই হয়তো 'রাষ্ট্রগুলির বিশালতা ও ক্ষুদ্রতার বিভিন্ন সুযোগসুবিধা'-র সদ্ব্যবহার করার সর্বোত্তম উপায়।

এটা বলা বাঞ্ছনীয় যে, প্রকৃত অর্থে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে সফল করতে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে আরও প্রশস্ত ও সুদৃঢ় করতে হবে। ভারতের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং রাষ্ট্রকে আরও শক্তি জোগানো যেতে পারে ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, জাতিগত ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে রাজনৈতিক অস্তিত্ব ও ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার মাধ্যমে। ভারতে বুদ্ধের আমল থেকে প্রচলিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মহান ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার এটাই একমাত্র উপায়।

একটি গল্প দিয়ে শেষ করি। খ্রিস্টজন্মের পূর্বে পঞ্চম শতাব্দীতে লিচ্ছোভি ও শাক্য প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যগুলিতে 'সন্‌থাগার' নামক একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছিল—এর মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন শরিকদের মধ্যে বিবাদ সহ প্রজাতন্ত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে বাদানুবাদ ও আলোচনা করা হত। বুদ্ধ কুড়ি বছর বয়সে শাক্যদের 'সন্‌থাগার'-এ যোগ দেন। যখন তাঁর বয়স আঠাশ, তখন শাক্য ও কোলদের মধ্যে রোহিনী নদীর জল নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হয়। সিদ্ধার্থ শাক্য সেনাপতির যুদ্ধের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কিন্তু মতদানের সময় সিদ্ধার্থের পরাজয় হয় এবং তাঁকে নির্বাসিত করা হয়। সেদিন বুদ্ধ পরাজিত ও নির্বাসিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু প্রজাতন্ত্র ও বলপ্রয়োগ ছাড়াই বিবাদের মীমাংসার ধারণা আজও বিদ্যমান। এই প্রজাতান্ত্রিক নীতিই রাষ্ট্রের প্রধান পথনির্দেশক।

আর অবশেষে, গত দু-বছরে যোজনার পাঠকদের সঙ্গে বিভিন্ন রোমাঞ্চকর বিষয়ে মত বিনিময়ের পর এবার বিদায় নেওয়ার সময় এসেছে। রাষ্ট্র নির্মাণের এই মহান যাত্রায় যোজনা পাঠকদের উদ্দীপিত করতে থাকবে। ❑

রাজস্ব যুক্তরাষ্ট্রিকতা ও স্থানীয় সরকারের ভূমিকা

সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম দৃষ্টান্ত ভারত। কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ সম্পর্ক দিয়ে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সূচনা ৭৩তম/৭৪তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সেই ব্যবস্থা হয়ে ওঠে প্রকৃত অর্থেই বহুস্তরীয়। পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠান ও নগরপালিকার হাত ধরে শাসন কাঠামোয় যুক্ত হয় তৃতীয় স্তর। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আর্থিক ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে এখনও অনেক বৈষম্য রয়ে গেছে। কীভাবে এই বৈষম্য দূর করা যায়? ভিত্তিস্তর থেকে পরিকল্পনার উদ্যোগ এক্ষেত্রে কি কাজে দেবে? নব গঠিত নীতি আয়োগ কি পূর্বতন যোজনা কমিশনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করে নতুন দিশা দেখাতে পারবে? লিখছেন **এম এ উম্মেন।**

বহু স্তরবিশিষ্ট সরকারি ব্যবস্থাপনাকেই যুক্তরাষ্ট্র বলে। একটি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ব্যয় সংক্রান্ত ও অন্যান্য আর্থিক দায়দায়িত্বের বণ্টন বা বিভিন্ন সরকারের মধ্যে আর্থিক ব্যবস্থাপনার হস্তান্তরের মধ্যেই নিহিত রয়েছে রাজস্ব যুক্তরাষ্ট্রিকতা—অর্থাৎ, আর্থিক যুক্তরাষ্ট্র তত্ত্ব বা আর্থিক বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সমন্বয়ের নির্যাস। সরকারের বিভিন্ন স্তরে দক্ষতার সঙ্গে ন্যায্য সহায়সম্পদ বরাদ্দের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক দায়িত্ব বণ্টনের মাধ্যমে একটি স্থিতিশীল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলাই একটি আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু ৭৩তম এবং ৭৪তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে যুক্ত হয় নবম এবং নবম-এ অংশ। সৃষ্টি হয় সরকারের তৃতীয় স্তর—ত্রিস্তরবিশিষ্ট পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠান। পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার হাত ধরেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রকৃত অর্থেই বহুস্তরবিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্র হয়ে উঠল, যার সঙ্গে যুক্ত হয় বহুস্তরীয় সরকারি আর্থিক দায়দায়িত্ব। ১৯৯৪ সালে এই সংশোধনী আইন পাস এবং রাজ্যগুলির তরফে এই সংশোধনীর সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ আইন কার্যকর করার পর কুড়ি বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। এটি নিঃসন্দেহে আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের পথে এক বড় পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে স্থানীয় গণতান্ত্রিক প্রশাসন গড়ে তোলার পথে জনসাধারণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এক গণতান্ত্রিক পরিসর গড়ে তোলা যাবে।

আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতির মূল ভিত্তিই হল স্থানীয় স্বশাসিত সরকারগুলির আর্থিক ক্ষমতায়ন। এবার যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির উত্তর খোঁজা প্রয়োজন তা হল সংবিধানের ২৪৩ জি এবং ২৪৩ ডব্লিউ-এর বিধান মতো স্থানীয় স্বশাসিত সরকারগুলি কি 'আর্থিক বিকাশ ও সামাজিক ন্যায়'-এর দিশা দেখানোর লক্ষ্য নিয়ে 'স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান' হিসেবে কাজ করছে? এতদিন সংবিধানবহির্ভূত প্রতিষ্ঠান হিসেবে যোজনা কমিশন কাজ করছিল। এটিকে ভেঙে দিয়ে ২০১৫-এর ১ জানুয়ারি থেকে নতুন প্রতিষ্ঠান নীতি (ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া) আয়োগ গঠন করা হয়েছে। এবার কি তবে সংবিধানের ২৪৩ জেড ডি অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত সাংবিধানিক সংস্থা অর্থাৎ জেলা পরিকল্পনা কমিটিগুলিকে (ডিপিসি) নতুন দায়িত্ব দেওয়া বা এগুলিকে নতুন করে গড়ে তোলার কথা ভাবা হচ্ছে? এই হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে যুক্তিসংগত করতে কী কী সংস্কার প্রয়োজন? স্থানীয় স্বশাসিত সরকারগুলির ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষমতা বণ্টনের নীতি নিয়ে নতুন করে ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। এই নিবন্ধে এ প্রসঙ্গেই কিছু উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন তুলে ধরা হল। ভুল উত্তর দেওয়ার চেয়ে সঠিক প্রশ্নটা তুলে ধরা অনেক বেশি জরুরি।

ভারতে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রের যে আদর্শ গড়ে উঠেছে বিশ্বের অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না। এ দেশের নতুন সরকারও এই সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং একে বজায় রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ। জার্মানি বা দক্ষিণ আফ্রিকার দৃষ্টান্তই ধরা যাক। এই দুই দেশেই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থাকলেও ফেডারেল বা কেন্দ্রীয় সরকারই প্রধান প্রধান নীতিগুলি নির্ধারণ করে এবং সরকারের অন্যান্য স্তরগুলি নিছকই রূপায়ণকারী সংস্থার ভূমিকা পালন করে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ব্রাজিলের মতোও নয়। ব্রাজিলে সরকারের তিনটি স্তর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, স্বশাসিত এবং সমান মর্যাদার অধিকারী। এই তিনটি স্তরই তাদের নীতিগত বিষয়ে সমান্তরাল ও উল্লম্বভাবে পরস্পরের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে চলে। ভারতকেও অবশ্যই সহযোগিতামূলক গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে 'মার্বেল কেক মডেল' বলা যাবে না। এমনটাও বলা যাবে না যে এখানে বিভিন্ন স্তরের আর্থিক দায়িত্বের মধ্যে বিরোধ দেখা দিচ্ছে না বা এখানে সরকারের সমস্ত স্তরকেই সমান বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। কেন-না এখানে প্রকৃত অর্থেই সরকারের অনেক স্তরকেই সমান অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। আসলে যুক্তরাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই কেন্দ্রের দিকে পাল্লা ভারী। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গড়তে গিয়ে রাজ্যস্তরে এবং স্থানীয় স্বশাসিত সরকার

স্তরে নিম্ন স্তর থেকে উচ্চ স্তর পর্যন্ত সহায় সম্পদ ও দায়দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে অনেক অসাম্য রয়ে গেছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বহুস্তরীয় চরিত্র (কেন্দ্র ও রাজ্যসহ ত্রিস্তরবিশিষ্ট পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠান, পুরসভা ও পুরনিগমগুলিকে নিয়ে গঠিত) এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যপূরণের জন্য হস্তান্তর ব্যবস্থার বহুবিধ পন্থা এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে।

সহযোগিতার নীতি এবং ভারতের সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রে বাস্তবোপযোগী সচল আর্থিক ক্ষমতাবণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলার অন্যতম শর্ত হল সরকারের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে কাজকর্ম, দায়দায়িত্ব ও নিয়ামক ক্ষমতার সমবণ্টন। 'কে কোন কাজ করবে?' এবং 'কে, কোথায়, কী কর নেবে?' এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের ভিত্তিতে এই ক্ষমতার বণ্টন হওয়া উচিত। পিছন ফিরে তাকালে দেখা যাবে ভারতে এই প্রশ্নগুলি কখনও ওঠেওনি, আর তাই সেগুলির সন্তোষজনক উত্তর খোঁজার চেষ্টাও হয়নি। ব্যয় সংক্রান্ত দায়িত্ব, রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব তথা নিয়ামক কাজকর্মের ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ ও প্রাসঙ্গিক নীতিটি হল সহযোগিতার মৌলিক সূত্রটি অনুসরণ করা, যেখানে বলা হয়েছে—যে বিষয়টি একটি বিশেষ স্তরেই সবচেয়ে সুচারুভাবে সম্পন্ন করা যাবে (অবশ্যই লেনদেন ও সমন্বয় কার্যের ন্যূনতম ব্যয় ধরে) সেই বিষয়টি সেই বিশেষ স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলির হাতেই ছেড়ে দিতে হবে, তার চেয়ে উঁচু স্তরে নিয়ে যাওয়া চলবে না। অন্যভাবে বলতে গেলে সরকারের প্রতিটি উঁচু স্তরের হাতে বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিয়ে নির্ভরযোগ্য দৃষ্টান্ত তৈরি করতে হবে। 'স্বশাসন'-এর কথা বললে অনেকেই নস্টালজিক হয়ে বৈদিক যুগের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উদাহরণ হয়তো দেবেন, কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারই স্থানীয় স্তরে 'ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র' গড়ে সেগুলিকে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠান করে তুলতে চেয়েছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন এবং সেইসঙ্গে প্রাদেশিক স্বশাসনের সূচনা পুরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে গণতান্ত্রিক পরিসর গড়ে তোলার কাজ কয়েক পদক্ষেপ এগিয়ে নিয়ে গেছে। এ কথা আমাদের সকলের জানা যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের মতাদর্শের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের ধারণা এবং গান্ধীজিও আগামী ভারতের সামাজিক জীবনের ভরকেন্দ্র হিসেবে তুলে ধরেছিলেন তাঁর 'গ্রামস্বরাজ'-এর ভাবনা। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে শুধুমাত্র ৪০নং অনুচ্ছেদে গ্রাম পঞ্চায়েতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, 'স্বশাসিত সরকারের এককসমূহ' গঠনের কথা নির্দেশমূলক নীতিসমূহের অঙ্গ হিসেবে সংবিধানে এসেছে। সংবিধানের আইনগতভাবে বলবৎযোগ্য কোনও অংশে এর উল্লেখ নেই। এমনকি ১৮৮৪ সালের লর্ড রিপন প্রস্তাবের মতো স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের ধারণাকেও গ্রহণ করা হয়নি সংবিধানে। এই কারণেই ৭৩তম/৭৪তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক ভুল সংশোধন করে স্থানীয় সরকারগুলিকে সাংবিধানিক মর্যাদা দিতে হয়েছে।

সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির কাজকর্ম ও কর সংক্রান্ত দায়িত্ব বণ্টন তিনটি তালিকা অনুযায়ী করা হয়েছে (সপ্তম তপশিলের আওতায়), যথা—কেন্দ্রের জন্য কেন্দ্র তালিকা, রাজ্যগুলির জন্য রাজ্য তালিকা এবং সেইসঙ্গে রয়েছে একটি যুগ্ম তালিকা, যে তালিকায় উল্লিখিত বিষয়গুলিতে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েরই এক্তিয়ার রয়েছে।

সংবিধানপ্রণেতারা প্রধানত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকেই অনুসরণ করেছিলেন এবং তারা সহযোগিতার নীতি প্রয়োগের পরিবর্তে একটা সাময়িক ঐতিহাসিক ব্যবস্থাপনা করতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। ৭৩তম/৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন সরকারের তিনটি স্তরে কাজকর্ম ও আর্থিক দায়দায়িত্ব নতুন করে খতিয়ে দেখার পাশাপাশি এ দেশে আরও যুক্তিসংগত সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার এক সুযোগ দিয়েছে। উক্ত দুটি সংশোধনী আইনের মাধ্যমে সংবিধানে দুটি নতুন তপশিল যুক্ত হয়েছে—যথা পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য একাদশ তপশিল এবং নগরাঞ্চলের স্বশাসিত সরকারগুলির জন্য দ্বাদশ তপশিল। রাজ্য ও যুগ্ম তালিকা থেকে এই দুই তপশিলের আওতাভুক্ত বিষয়গুলিকে বেছে নেওয়ায় সব পক্ষই সন্তুষ্ট হল। কিন্তু স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের আর্থিক পরিসর বা আর্থিক দায়িত্বের প্রশ্নটি সম্পর্কে ধোঁয়াশা রয়েই গেল। ৭৩তম/৭৪তম সংবিধান সংশোধনীর বিধানগুলি বাস্তবে কার্যকর করা যে কতখানি অসুবিধাজনক, তা গভীরভাবে উপলব্ধি করে কেরল সরকার। এই কারণেই কেরল সরকার একাদশ ও দ্বাদশ তপশিলের আওতাভুক্ত বিষয়গুলিকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও সহায়ক কর্মকাণ্ডে (সাব-অ্যাক্টিভিটি) ভাগ করে একটা এলোমেলো এবং দিশাহীন অবস্থাকে নির্দিষ্ট রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করেছে।[১] অনেক দেরিতে ২০০৪ সালে গঠিত পঞ্চায়েতিরাজ মন্ত্রক এই গুরুতর সমস্যা উপলব্ধি করেছে এবং রাজ্য স্তরে কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করার (অ্যাক্টিভিটি ম্যাপিং) উদ্যোগ নিয়েছে। যাই হোক, কখনও না হওয়ার চেয়ে দেরিতে হওয়া ভালো। কর্মকাণ্ড নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করার উদ্যোগের সমান্তরালভাবে দায় দায়িত্ব, তহবিল এবং সেইসঙ্গে কর্মকর্তাদের ক্ষমতার হস্তান্তর যদি না হয়, তাহলে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার যথাযথ বাস্তবায়ন কখনওই সম্ভব নয়।

এই অংশে আমি আরও একটি বিষয়ের উপর পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, যা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়ে গেছে এবং এই বিষয়টি যথেষ্ট অস্বস্তিকর। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের সপক্ষে যাঁরা সওয়াল করেন, এই অংশটি তাঁদের যুক্তিকে দুর্বল করে দেয়। এটি হল রাজ্য তালিকার ৫নং বিষয়, যেখানে বলা হয়েছে—"স্থানীয় সরকার, এর অর্থ, সংবিধান এবং পুরনিগমসমূহ, উন্নয়নমূলক অছিসমূহ, জেলা পর্ষদসমূহ, খনি এলাকার বসতি কর্তৃপক্ষসমূহ (সাইনিং সেটেলমেন্ট অথরিটিজ) এবং স্থানীয় স্বশাসন বা গ্রামীণ প্রশাসনের উদ্দেশ্যে গঠিত অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা [ভারতের সংবিধান, সপ্তম তপশিল, তালিকা-২, রাজ্য তালিকা]।"

উন্নত প্রশাসনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ (যেটি যুক্তিসংগত প্রশাসনও বটে) বর্তমান সরকারকে সংবিধানের এই অংশটিকে বিলোপ করতে হবে এবং একাদশ ও দ্বাদশ তপশিলকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি ও সহায়ক কর্মসূচির রূপরেখা তুলে ধরে সম্পূর্ণ নতুন স্থানীয় তালিকা তৈরির কাজ শুরু করতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় নীতি আয়োগ : বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়

এ কথা ঠিক যে, পূর্বতন যোজনা কমিশন একসময় অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতাও এই সংস্থার ছিল না। তা সত্ত্বেও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে এই কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আর সেখান থেকেই সংস্কার ও পুনর্গঠনের যে কোনও উদ্যোগ শুরু হওয়া উচিত। প্রথমত, এই কমিশন বিস্তারিত পর্যালোচনা ও সমীক্ষার ওপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পাঁচ বছরের পরিকল্পনার নকশা তৈরি করেছে এবং দেশ তথা দেশের অর্থনীতির সামনে সামগ্রিক অর্থনৈতিক (ম্যাক্রো-ইকনমিক) লক্ষ্য ও পরিকল্পনাসমূহ স্থির করে দিয়েছে। আগামী দিনে এই কাজ কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, সে ব্যাপারে 'নীতি' আয়োগকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কেও। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সংবিধানের ভিত্তিতে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয়েছিল, প্রায় সেই জন্মলগ্নেই গঠিত হয়েছিল যোজনা কমিশন। এই কমিশনের অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে ছিল সহায়সম্পদ বণ্টন। সংবিধানের ২৮০নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন গঠনের অন্যতম কারণ কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব ও ব্যয় সংক্রান্ত দায়দায়িত্বের ক্ষেত্রে নীচ থেকে ওপরের স্তর পর্যন্ত ক্ষমতার অসম বণ্টন। আর সেইসঙ্গে সহায়সম্পদ বণ্টন (আর্থিক, বস্তুগত ও প্রাকৃতিক), যেটুকু উন্নয়ন হয়েছে বা যেটুকু বাকি রয়েছে, অনগ্রসরতা, পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমান্তরাল স্তরের মধ্যে অসাম্য দূর করার প্রয়োজনীয়তাও ছিল এই কমিশন গড়ে তোলার অন্যতম নেপথ্য কারণ। সংবিধানের ২৮২নং অনুচ্ছেদের বিবিধ সংস্থান অনুযায়ী যোজনা কমিশন বিলি বরাদ্দ সংক্রান্ত ক্ষমতা হাতে পেয়েছে। এটি কেন্দ্র, রাজ্য ও যুগ্ম তালিকার বাইরে এক 'অবশিষ্ট ক্ষমতা', যা বিরল পরিস্থিতিতে জনস্বার্থে অনুদান মঞ্জুর করার জন্য সংবিধানে রয়েছে। তাই যোজনা কমিশনের এই বিলি-বরাদ্দের ক্ষমতার সংবিধানগতভাবে জোরালো ভিত্তি নেই। বিষয়ভিত্তিক হস্তান্তর হিসেবে সূচনা হলেও ১৯৬৯ সাল ও তার পরবর্তী সময়ে সহায়সম্পদ বরাদ্দকে নির্দিষ্ট সূত্রভিত্তিক করে তোলা হয়। তৎকালীন উপাধ্যক্ষ বা ডেপুটি চেয়ারম্যান ডি আর গ্যাডগিলের নামে এই সূত্র বা ফর্মুলার নামকরণ করা হয়। এই সূত্র পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত হলেও সেখানে কমিশনের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গা রাখা হয়েছে। তা নিয়ে রাজ্যগুলির তরফে তীব্র প্রতিবাদ এসেছে। ৭৩তম/৭৪তম সংবিধান সংশোধনীর পরে সংযোজিত ২৪৩ আই এবং ২৪৩ ওয়াই অনুচ্ছেদ কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের আদলে রাজ্য এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত ও সমান্তরালভাবে চারিয়ে যাওয়া অসাম্য দূর করতে রাজ্য অর্থ কমিশন গঠনের পথ প্রশস্ত করেছে। এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা প্রয়োজন যে, রাজ্য অর্থ কমিশনগুলির সুপারিশের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন যাতে পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিকে অতিরিক্ত সহায়সম্পদের জোগান দিতে পারে সেইজন্য ৭৩তম/৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন ২৮০নং অনুচ্ছেদকে সংশোধন করেছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং পুনর্গঠনের কোনও উদ্যোগ এই বিষয়টিকে অস্বীকার করতে পারে না। তৃতীয়ত, প্রধান প্রধান নীতিরচনা ও প্রকল্পের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যোজনা কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে নীতি আয়োগকেই যদি একমাত্র পরামর্শদাতা সংস্থা বা 'থিংক ট্যাংক' হতে হয়, তাহলে এ কাজের জন্য উপযুক্ত মানের গবেষণা ও আলোচনার পরিসর খোলা রাখতে হবে। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে এ কাজ সম্ভব নয়।

ভিত্তি স্তর থেকে পরিকল্পনা রচনার লক্ষ্যে পদক্ষেপ

নীতি আয়োগের কাজের বিশদ রূপরেখা এখনও প্রকাশ করা না হলেও নতুন জমানায় এ দেশে একেবারে ভিত্তিস্তর থেকে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হবে সে ব্যাপারে যথেষ্টই আভাস মিলেছে। ২৪৩ জি, ২৪৩ ডব্লিউ, ২৪৩ জেড ডি বা ২৪৩ জেড ই অনুচ্ছেদেও বাধ্যতামূলকভাবে একদম প্রাথমিক স্তর থেকেই পরিকল্পনা রচনার কথা বলা হয়েছে। ২৪৩ জি এবং ২৪৩ ডব্লিউ-এর বিধান অনুযায়ী গ্রাম ও শহরের স্থানীয় স্বশাসিত সরকারগুলিকে এমন 'ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং দায়িত্ব' দিতে হবে যাতে তারা 'স্বশাসিত সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করতে পারে' এবং 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার' লক্ষ্যে পরিকল্পনা রচনা করতে পারে এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলির রূপায়ণ ঘটাতে পারে। ২৪৩ জেডি অনুচ্ছেদে সমস্ত রাজ্যকে জেলা পরিকল্পনা কমিটি (ডিপিসি) এবং মহানগর এলাকার জন্য মহানগর পরিকল্পনা কমিটি (২৪৩ জেড ই) গঠন করতে বলা হয়েছে। জেলার পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলির তৈরি পরিকল্পনাগুলিকে একত্রিত করে সামগ্রিকভাবে সংশ্লিষ্ট জেলার জন্য একটি 'খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা' তৈরি করাই জেলা পরিকল্পনা কমিটির কাজ এবং এই খসড়া পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে সুসংহত স্থান ও অবস্থানগত পরিকল্পনা ও দক্ষতার সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হবে। রাজ্য স্তর ও স্থানীয় স্বশাসিত সরকার স্তরে উপযুক্ত নীতি গ্রহণের মাধ্যমে এই খসড়া পরিকল্পনাটিকে বাস্তবে কার্যকর করতে হবে। আর সেজন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক এবং পদ্ধতিগত ব্যবস্থাও নিতে হবে।

এ দেশে ২.৫ লক্ষ পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠান এবং ৩৮৪২টি শহরাঞ্চলীয় স্বশাসিত সরকারে ৩০ লক্ষেরও বেশি মানুষ

প্রতিনিধিত্ব করছেন। এই ব্যাপক গণতান্ত্রিক ভিত্তি বিশ্বের অন্য কোনও দেশে নেই। গণতান্ত্রিকভাবে একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে পরিকল্পনা রচনার এই অনন্য সুযোগ জাতীয় স্বার্থে কাজে লাগানো যেতে পারে। এ দেশে ভিত্তিস্তর থেকে ক্রমশ উচ্চ পর্যায়ের যে পরিকল্পনা (বটম আপ প্ল্যানিং) রচনার জন্য গ্রামসভা, জেলা পরিকল্পনা কমিটি, রাজ্য অর্থ কমিশন তৈরি হয়েছে বা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বের অন্যান্য পথ খুলে গেছে, তা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণের পথে প্রচলিত ব্যবস্থাকে উজ্জীবিত করেছে। কেরল দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করেছে যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে স্থানীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অবশ্যই সম্ভব। জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা তথা ভিত্তিস্তর থেকে ক্রমশ উচ্চ পর্যায়ের জন্য (বটম আপ প্ল্যানিং) পরিকল্পনা রচনার উদ্যোগের ব্যাপারে সচেতনতা প্রসারের জন্য এ রাজ্যে (কেরল) প্রথমে প্রচারাভিযান চালানো হয়েছিল। পরে সেন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এই বিষয়টিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত সেন কমিটি ছিল বিশেষজ্ঞ কমিটি এবং এই কমিটি প্রচারাভিযান চলাকালীনই তার কাজ করেছিল। গ্রামসভা যে প্রয়োজনীয়তাগুলি অনুভব করে সেগুলি চিহ্নিত করা ও খতিয়ে দেখা থেকে শুরু করে জেলা পরিকল্পনা কমিটির চূড়ান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন পর্যালোচনা করে কেরল প্রতিনিধিত্বমূলক পরিকল্পনার এক বহুস্তরীয় প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছে। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরসভাকে যেভাবে উন্নয়ন প্রতিবেদন তৈরি ও মুদ্রণ করতে হয় তা কম কথা নয়। এই উন্নয়ন প্রতিবেদনগুলিতে প্রত্যেক এলাকার সহায়সম্পদের বিস্তারিত তালিকা থাকে এবং সেইসঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্যও আলোচনা করা হয়। এই আলোচনাকে 'উন্নয়নমূলক আলোচনা চক্র' (ডেভেলপমেন্ট সেমিনার) নামে অভিহিত করা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলি ক্ষেত্রভিত্তিক বিভিন্ন টাস্কফোর্স (পরে এগুলির নতুন নাম দেওয়া হয় কর্মীগোষ্ঠী, প্রতি স্বশাসিত সরকারের জন্য প্রায় ১০-১১ জনের কর্মীগোষ্ঠী) গঠন করে তাদের ওপর বিভিন্ন প্রকল্প তৈরির দায়িত্ব দেয়। দুজন গবেষকের মতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল (উন্নয়ন) প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করার জন্য প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরসভায় উন্নয়নমূলক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা, যাতে গ্রামসভাস্তরে ওয়ার্ডভিত্তিক উন্নয়নের যে আলোচনার সূচনা হয় তাকে 'গ্রামের উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়' [ইশাক এবং ফ্রাংক (২০০০) : ১০৫]। জনসাধারণের পরিকল্পনা প্রচারাভিযানের অঙ্গ হিসেবে গ্রামসভা, রাজনৈতিক দলের নেতা, সরকারি কর্মকর্তা (সিভিল সার্ভেন্ট), স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের নিয়ে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ যেভাবে উন্নয়নমূলক আলোচনাচক্রগুলিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন [(দ্রষ্টব্য রাজ্য যোজনা পর্ষদ (এসপিবি), (২০০০)], অর্থনৈতিক সমীক্ষা, তা বিকেন্দ্রীভূত গণতান্ত্রিক কাঠামোয় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান ও প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার গুরুত্বকেই তুলে ধরে। তবে সমস্ত আলোচনাচক্রই যে সমানভাবে সফল হয়েছে বা বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা প্রকল্পের কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই, এ কথা বলা ভুল। তা সত্ত্বেও এই বিষয়গুলিকে যেভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে তা নিঃসন্দেহে একটা বড় সাফল্য। পরিকল্পনা প্রচারাভিযানের শুরুর দিনগুলিতে রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদ মালায়লম্ ভাষায় বিস্তারিত নির্দেশিকা পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল এবং পরিকল্পনা প্রকল্প তৈরিতে জনসাধারণকে সাহায্য করেছিল।[২] জেলা পরিকল্পনা পদ্ধতির বিষয়ে কেরল সরকারের (২০০৯) একটি অধ্যায় রয়েছে এবং সেইসঙ্গে রয়েছে কোল্লাম জেলা পরিকল্পনার যাবতীয় নথিপত্রও।[৩] এ দেশের নতুন সরকার যদি 'একেবারে ভিত্তিস্তর থেকে শুরু করে উচ্চ পর্যায়ের' পরিকল্পনা বা 'বটম আপ প্ল্যানিং'-এর ব্যাপারে সত্যিই আন্তরিক হয় তাহলে এ রাজ্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে অন্যান্য উদ্যোগের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের 'বটম আপ প্ল্যানিং'-এর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে ডিএফআইডি-এর সহায়তায় বাছাই করা কিছু গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০০৬-০৭ সালে এই উদ্যোগের সূচনা হয়েছিল।

সংবিধানে পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠান ও শহরের স্থানীয় সরকারগুলিকে 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে পরিকল্পনা রচনা করতে বলা হয়েছে, তার গুরুত্ব অন্য। এটি এক ধরনের সামগ্রিক পরিকল্পনা। বিভাগীয় স্তরে এই ধরনের পরিকল্পনার রচনা ও রূপায়ণে এই রীতি কখনওই সঠিক পদক্ষেপ হবে না। ভারতে এই দপ্তর ও বিভাগের ফাঁসই সবচেয়ে বড় অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। ভিত্তিস্তর থেকে পরিকল্পনার এই উদ্যোগ (বটম আপ প্ল্যানিং) যতই জোরকদমে চলুক না কেন, পঞ্চায়েতগুলির হাতে প্রকল্পভিত্তিক তহবিল ছাড়া যদি অন্য কোনও তহবিল না থাকে তাহলে এই উদ্যোগ অর্থহীন হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ও কর্ণাটকের প্রকল্প হস্তান্তরভিত্তিক তথাকথিত বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।[৪] স্থানীয় সরকারগুলির হাতে পূর্ব-নির্ধারণযোগ্য 'মুক্ত তহবিল' বা 'আনটায়েড ফান্ড'-এর জোগান থাকতে হবে, অর্থাৎ যে তহবিলের অর্থে নিজের স্বাধীনতা অনুযায়ী পরিকল্পনা ও অগ্রাধিকারগুলিকে চিহ্নিত করা যাবে।

নীতি আয়োগ অবিলম্বে এক দেশব্যাপী অবস্থা-সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরির দায়িত্ব দিতে পারে ও ২০০৮ সালে পরিকল্পনার জন্য তৈরি নির্দেশিকা সহ যোজনা কমিশনের বিভিন্ন প্রচেষ্টা নিয়ে বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনা চালাতে পারে এবং তারপর স্থানীয় বৈচিত্র্যগুলিকে স্থান দিয়ে একটি রূপরেখা তৈরির লক্ষ্যে কাজ করতে পারে। দেশের ৬৪০টি জেলাই যদি শেষ পর্যন্ত একটি দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যের ভিত্তিতে জেলা পরিকল্পনা তৈরি করে এবং সেই পরিকল্পনার অন্তর্গত মাঝারি মেয়াদের লক্ষ্যগুলির ভিত্তিতে বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করা যায়, তাহলে এ দেশে প্রকৃত অর্থেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রকাশ ঘটবে। স্থানীয় সরকার স্তরে ভূস্তরের চিহ্নিতকরণ বা জিওলোকেশন, মৃত্তিকা, ভূগর্ভস্থ জল, শস্য, নদী অববাহিকা, জলবিভাজিকা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভৌগোলিক

তথ্যভিত্তিক (জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন বেসড ডেটা) ব্যবস্থাপনার কাজে এ দেশ এতটাই উন্নতি করেছে যে, স্থানীয় স্তরের বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনাকে মোটেই অলীক স্বপ্ন বলে ভাবা যাবে না। এর পরিপূরক হিসেবে জনগণনা এবং পরিবারভিত্তিক অর্থ সামাজিক অবস্থার তথ্য (সাময়িকভাবে সমীক্ষার কাজে বিদ্যালয় শিক্ষকদের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে) হাতে পাওয়া গেলে পারিবারিক স্তরের পূর্ণাঙ্গ ছবি মিলবে, যা ভিত্তিস্তরের পরিকল্পনার খুঁটি হয়ে উঠতে পারবে। কিন্তু আসল প্রশ্নটা হল, দেশে জেলা পরিকল্পনা কমিটিগুলি যেভাবে কাজ করে তাতে তাদের কাজের গঠনকাঠামোর সমস্ত স্তরে 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায়' প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত রাজনৈতিক, আইনি ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতা কি রয়েছে? নীতি আয়োগ এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে ভালো হয়।

হস্তান্তর ব্যবস্থাকে যুক্তিসংগত করা

যুক্তিসংগত, দক্ষ ও ন্যায্যভাবে আর্থিক দায়দায়িত্বের হস্তান্তর একটি উন্নত সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অত্যাবশ্যক শর্ত। কিন্তু ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আর্থিক ক্ষমতা বণ্টনের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা হল বহুরকম প্রণালী (চ্যানেল) ও তাদের বিবিধ লক্ষ্য ও শর্তাবলির উপস্থিতি। এর পরিণামে পরস্পরবিরোধী অগ্রাধিকার ও ব্যর্থ ফলাফল। যোজনা কমিশনের বিলি বরাদ্দের ক্ষমতা বিলোপ করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। মোট বাজেট সহায়তার শতাংশের হিসাবে কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পগুলির (সিএসএস) অংশ ক্রমশই বেড়েছে। বি কে চতুর্বেদী কমিটির (২০১১) সুপারিশ মেনে এই ধরনের প্রকল্পের সংখ্যা কমানো হলেও আজও এগুলির উপস্থিতি যথেষ্টই। দেশে আরও ন্যায্য ও যুক্তিসংগত হস্তান্তর ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে গেলে এই প্রকল্পগুলিরই সমস্যার সমাধান করে কীভাবে বাস্তবোপযোগী হস্তান্তর ব্যবস্থার অঙ্গ করে তোলা যায়, তা সবার আগে স্থির করতে হবে। কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পগুলির রূপায়ণকারী রাজ্যগুলির তরফে পালটা অর্থ প্রদানের যে নীতি তার ফল হয়েছে ভয়াবহ। এতে তাদের অগ্রাধিকারগুলি ভীষণভাবেই মার খেয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামগ্রিক দিক থেকে এগিয়ে থাকা কেরলের মতো রাজ্য এবং ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার মতো অনগ্রসর এলাকাকে একই সর্বভারতীয় মানদণ্ডে বিচার করা হয়েছে এবং সর্বোপরি একতরফাভাবে বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণা করে রাজ্যগুলির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে (এই ধরনের প্রতিটি ঘোষণা সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হানার শামিল)। এই সমস্যাগুলি সমাধানের আশু প্রয়োজন।

আর্থিক দিক থেকে ভারত বিশ্বে সর্বাধিক কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র। কমিউনিস্ট চীনের এককেন্দ্রিক সরকারও ভারতের চেয়ে অনেক বেশি বিকেন্দ্রীভূত। হস্তান্তর ব্যবস্থাপনার ঐতিহাসিক পরম্পরার প্রেক্ষিতে এই দেশে বিভিন্ন স্তরে (নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত) বা সমান্তরালে যে অসাম্য রয়েছে, তা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনার ভার কি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের ওপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত? যাই হোক না কেন, এই কয়েক বছরে উন্নয়নের প্রশ্নে ভারত নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কাছে এসেছে, নাকি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থেকে সরে গেছে তা নতুন করে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। এবার নীতি আয়োগের নতুন ভাইস চেয়ারম্যান অরবিন্দ পানগাড়িয়ার দায়িত্ব এ ব্যাপারে নতুন করে সমীক্ষার নির্দেশ দেওয়ার। অবশ্যই পরামর্শদাতা সংস্থাগুলি অনুমানের ভিত্তিতে কাজ করতে পারে না। স্বাধীনতার ৫৮ বছর পরেও 'স্বচ্ছ ভারত' প্রচারাভিযানের অঙ্গ হিসেবে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে যখন বড় ঝাঁটা হাতে রাস্তা সাফাইয়ের কাজে নামতে হয়, তখন চলতি 'উন্নয়নের' ধরন নিয়ে সত্যিই লজ্জা লাগে। কার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এ দেশের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছিল, এই ঘোরালো প্রশ্নের জবাব খোঁজার প্রয়োজন কি নেই? পঞ্চায়েতগুলিকে শক্তিশালী করে তোলা (তাদের প্রকৃত অর্থেই 'স্মার্ট' করে তোলা) এবং ৭৩তম/৭৪তম সংবিধান সংশোধনীতে বর্ণিত বাসস্থান নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের কাছে স্যানিটেশন, পানীয় জল, আবাসন, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ব্যবস্থার (সড়ক এবং ইনটারনেট) মতো মৌলিক সুযোগসুবিধা ও অন্যান্য জনপরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার সারমর্ম অনুসরণ করার দিকে অবিলম্বে নজর দেওয়া প্রয়োজন। স্থানীয় স্বশাসিত সরকারগুলিকে নিজস্ব সহায়সম্পদ সংগ্রহে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। কিন্তু পঞ্জাব, রাজস্থান ও হরিয়ানা সরকার যেভাবে সম্পত্তি কর বিলোপ সহ আরও যে কয়েকটি পশ্চাৎমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে, তা নিয়ে গভীর চিন্তার অবকাশ রয়ে যায়। অথচ বিশ্বের ৮০ শতাংশ দেশেই স্থানীয় সরকারগুলির কাছে আয়ের মূল উৎস সম্পত্তি কর।

তবে স্থানীয় স্বশাসিত সরকারগুলি যাতে রাজস্ব সংগ্রহের একই রকম প্রচেষ্টা নিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসী থেকে শুরু করে নয়াদিল্লির অভিজাত নাগরিকদের তুলনীয় জনপরিষেবা দিতে পারে, সেজন্য এমন এক হস্তান্তর ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা জরুরি যা তাদের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন যে সাধারণ কর্মকুশলতা অনুদানের সুপারিশ করেছে তা সমতাবিধান অনুদান না হলেও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের পথে বড় পদক্ষেপ। তবে তার জন্য পরবর্তী কাজ জারি রাখতে হবে। কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার মতো যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের তুলনায় নিম্ন স্তর থেকে উপরি স্তরের মধ্যে অসাম্য অনেক কম। এই দুই যুক্তরাষ্ট্রেই সমতাবিধান অনুদানের রীতি প্রচলিত। নীতি আয়োগ এবং ভবিষ্যতের কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনগুলি এই বিষয়টি মাথায় রাখতে পারে। তবে সাধারণ নাগরিকদের মৌলিক পরিষেবার দাবি না মিটিয়ে রাজ্যগুলিকে 'ফিসক্যাল রেসপনসিবিলিটি ও বাজেট ম্যানেজমেন্ট' আইনের শর্তগুলি মানতে উৎসাহিত করা অসাংবিধানিক না হলেও অবশ্যই অনুচিত।

পরিশেষে

ভারত সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। স্থানীয় স্বশাসিত সরকারগুলি বর্তমান ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভিত্তিস্তর

থেকে পরিকল্পনা রচনার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে তাদের মধ্যে। এই পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগের উপযোগী করে তুলতে গেলে প্রথমে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উপযুক্ত নীতি নির্বাচন ও সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অর্থনৈতিক সংস্কারের পেছনে ছুটতে গিয়ে এই কাজটি যেন উপেক্ষিত না হয়। হাতের সামনে এমন সুবর্ণ সুযোগ এবং একটি গণতান্ত্রিক কাজে সঠিক দিশা দেখানোর এটিই প্রকৃত সময়। সমাজের প্রান্তিক, সুযোগসুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী যখন নিজেদের শর্তে সমাজের মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন, তখনই সমাজে সকলকে শামিল করা বা 'সোশ্যাল ইনক্লুশন'-এর প্রকৃত অর্থ তার মহিমা ফিরে পাবে। একেই প্রকৃত অর্থে 'ধর্ম' বলে। স্থানীয় স্বশাসিত সরকাগুলিকে শক্তিশালী করলে সেই লক্ষ্যপূরণের পথে কয়েক কদম এগোনো যাবে।❑

[লেখক কেরলের চতুর্থ অর্থ কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান।
email: maoommen09@gmail.com]

সহায়ক সূত্র :

১ কেরল সরকার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করে (১৯৯৬-১৯৯৯) [কমিটির প্রথম চেয়ারপার্সন সুব্রত সেনের নাম অনুসারে এই কমিটি সেন কমিটি নামেই বেশি পরিচিত হয়।] বিভিন্ন কাজকর্ম চিহ্নিত করার পাশাপাশি স্থানীয় স্বশাসিত সরকারগুলির হাতে আর্থিক, প্রশাসনিক ও কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসন ও পরিকল্পনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার বিভিন্ন পন্থার সুপারিশ জানানোই ছিল এই কমিটির প্রধান কাজ। বর্তমান নিবন্ধের লেখকও এই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন।

২ কেরলের বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা প্রকল্পের নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়নের জন্য, দ্রষ্টব্য কেরল সরকার (২০০৯)।

৩ কোল্লাম জেলা পরিকল্পনাসহ বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার আধুনিক মূল্যায়নের জন্য পড়া যেতে পারে ভারত সরকার (২০১৩), খণ্ড ১, অধ্যায় ৫।

৪ পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় রাজ্য অর্থ কমিশনের পর্যবেক্ষণ হল পশ্চিমবঙ্গের জেলা পরিকল্পনা কমিটিগুলি বিজ্ঞানসম্মতভাবে জেলা পরিকল্পনা তৈরির বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। যথাযথ সমন্বয় ছাড়াই বিচ্ছিন্ন কিছু প্রকল্পকে জুড়ে দিয়ে একত্রিত করা হয়েছে এবং সমস্ত জেলায় জেলা পরিকল্পনা হিসেবে সেগুলির ওপর তকমা লাগানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ (২০০৮) : ১০১।

WBCS ই যদি একমাত্র লক্ষ্য হয়

প্রিলির জন্য
- বিগত বছরের প্রশ্নগুলো থেকে দেখো কোন কোন এরিয়া থেকে প্রশ্ন আসছে, প্রশ্ন কিভাবে আসছে।
- অপশন যাতে না গুলোয় সেদিকে নজর দাও।

মেইন এর জন্য
- GS - পেপারে ইতিহাস, ভূগোলে কনসেপ্টচুয়াল প্রশ্ন তৈরী করো।
- অপশনালের উত্তরে শুরু শেষ মাঝের পয়েন্ট বিশ্লেষণ স্টাইল এখন থেকে রপ্ত করো।

WBCS, 2012 - EXC
ROLL NO. 0102855

WBCS, 2011 - REVENUE OFFICER
ROLL NO. 0201935

C/o ডেডিড স্যার

কথাগুলো ভেবো, বারবার পরীক্ষা দেওয়ার ক্লান্তি থেকে মুক্তি পাবে।
- প্রিলি মেন অপশনালের জন্য ফোন করে দেখতে পার
- শুধু অপশনাল বা GS -এর যেকোনো পেপার সারা বছর পড়ার জন্যও ফোন করতে পারো।

5 টিচার্স গ্রুপ 9593411432 দমদম-নবদ্বীপ-বর্ধমান (সন্ধ্যায়ও ক্লাস হয়)

নীতি আয়োগ ও ভারতের রাজস্ব যুক্তরাষ্ট্রিকতা

যুক্তরাষ্ট্রিকতাকে সফল করতে শুধুমাত্র কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের শাসনক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ যথেষ্ট নয়। ভারতের মতো গণতন্ত্রে রাজনীতি ও অর্থনীতির মিশেল থাকবেই। স্থায়ী আর্থিক বিকাশের জন্য দেশে যে সত্যিকারের রাজস্ব যুক্তরাষ্ট্রিকতার প্রয়োজন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ কাজে অধুনালুপ্ত যোজনা আয়োগের সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে তোলপাড় কম হয়নি। সম্প্রতি এসেছে নীতি আয়োগ। অর্থনৈতিক বিকাশ ও শাসনের মানোন্নয়নে কী হবে এর ভূমিকা—লিখছেন **নির্বিকার সিং।**

উঠে গেল যোজনা আয়োগ। গত মে মাসে গদিতে বসার পর ঋণদানি এই আয়োগের ঝাঁপ বন্ধ করার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেনি নয়া কেন্দ্রীয় সরকার। অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজ্যগুলির ভূমিকা জোরদার করার সদিচ্ছাতেই এ পদক্ষেপ। পূর্বজের তুলনায় নীতি আয়োগে স্বাভাবিকভাবে রাজ্যের বক্তব্য বেশি গুরুত্ব পাবে। তবে, আদত বদল আসবে কেন্দ্র থেকে রাজ্যে তহবিল হস্তান্তরের ধরনধারণে। এজন্য রাজ্যের ক্ষমতা বাড়ানো দরকার। সেইসঙ্গে তাদের দায়বদ্ধতাও। কেন্দ্র-রাজ্য হস্তান্তরে স্বচ্ছতা, নজরদারি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাদির উন্নতি চাই। অযথা কালক্ষেপ নয়, ঠিক সময়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। জটিলতা দূর করে গোটা ব্যাপারটা হবে সহজ-সরল। এসব মৌল পরিবর্তন ছাড়া, নতুন থিংক ট্যাংক বা সহযোগিতামূলক দাবিতে যুক্তরাষ্ট্রিকতা চালু করা গেছে এ ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোনও হেলদোল হবে না।

উঁচু থেকে নীচুতে তহবিল হস্তান্তর যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আদত। করের মাধ্যমে টাকাকড়ি জোগাড়ে কেন্দ্রের সুযোগ ঢের বেশি। আর সাধারণ মানুষের বিভিন্ন কাজে টাকা খরচে রাজ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির এগিয়ে থাকার কথা। দেশে কর ব্যবস্থার এলেম বাড়ানোর জন্য চেষ্টা চলছে লাগাতার। এ কাজে সাফল্যও এসেছে। তবে ব্যয় ও কেন্দ্র থেকে রাজ্যে তহবিল জোগানোর ক্ষেত্রে এখনও অনেক সংস্কার বাকি। জেলা পরিষদ, পুরসভার মতো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে খরচখরচা ও রাজ্য সরকারের দেওয়া অর্থ নিয়েও একই কথা খাটে।

হস্তান্তরের ক্ষেত্রে, রাজ্য সরকারের প্রান্তিক ব্যয়ে ভরতুকির ব্যবস্থায় যৌথ ভাণ্ডারের সমস্যা (কমন পুল প্রবলেম) অর্থাৎ টানাটানি থেকে যায়। ঝিল থেকে একজন মৎস্যজীবী মাছ ধরলে ঠিক আছে। কিন্তু দলে দলে মৎস্যজীবী ঝাঁপিয়ে পড়লে যেমন সমস্যা সৃষ্টি হয়, তেমন আর কী। ঘাটতি পূরণজনিত হস্তান্তর এই অদক্ষ ব্যবস্থার এক নমুনা। পক্ষান্তরে, কিছু হস্তান্তরে গ্রহীতা রাজ্য সরকারের প্রান্তিক ব্যয় প্রভাবিত হয় না। ফলে অর্থনীতি অধিকৃত থাকে। এখানে একটি বিষয়ে পার্থক্যের দিকে খেয়াল রাখা জরুরি। কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ্য থাকে রাজ্য সরকারের রাজস্ব ক্ষমতা বৃদ্ধি। আবার অনেক সময় রাজ্য ও দেশের মঙ্গলের মধ্যে চলে টানাপোড়েন।

ব্যারি ওয়াইনগাস্ট এবং তার সহ বই-লিখিয়েরা (যেমন, ক্যারিগা ও ওয়াইনগাস্ট, ২০০১) উন্নয়নশীল দেশের জন্য আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু মোকাবিলার চেষ্টা করেছেন। যেমন, রাজস্ব ক্ষমতা ও ভাগাভাগি পদ্ধতি পরিচালনা সংক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশজনিত প্রভাব। কিছুটা অতিসরলীকরণের ঝুঁকি নিয়ে, আমরা প্রসঙ্গ বা বিষয়গুলি দুই প্রস্তে ভাগ করতে পারি। স্ট্যান্ডার্ড পাবলিক ফিন্যান্সে রাজ্যগুলির এক্তিয়ারভুক্ত আয় জানা, এটা ধরে নিয়ে ট্যাক্স অ্যাসাইনমেন্ট ও হস্তান্তরের ইনসেনটিভের দিক দেখা হয়। আর বিকাশ প্রেক্ষিতটি বা গ্রোথ পার্সপেকটিভ আয় বাড়ানোর জন্য (যেমন, সরকারি বা বেসরকারি লগ্নি মারফত) ইনসেনটিভে কর ও হস্তান্তর ব্যবস্থার প্রভাব খতিয়ে দেখে।

ক্যারিগা ও ওয়াইনগাস্ট (২০০১) একটি মডেল ব্যবহার করেছেন যাতে সরকারের নীতিনির্ধারকরা কর ভিত্তির চৌহদ্দি বাড়াতে পারেন। বিকাশ বৃদ্ধিকারী যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যের প্রান্তিক রিটেনশন হার বেশি। ভারতের ক্ষেত্রে এই যুক্তি অর্থ আয়োগের (ফিন্যান্স কমিশন) হস্তান্তর সূত্র সংশোধনে সমর্থন করতে পারে। এমনকি, বিভিন্ন স্তরের সরকারের কর বসানোর এক্তিয়ার হেরফেরের মাধ্যমে উঁচু থেকে নীচে সম্পদ হস্তান্তরের মাত্রা কমানো যায়। ভারতে হস্তান্তরের অন্যান্য মাধ্যমের ভূমিকা ও বিধিব্যবস্থা নিয়ে নতুনভাবে ভাবনাচিন্তা করার খোরাক মেলে এতে।

অর্থ আয়োগ, যোজনা আয়োগ (এখন এর উত্তরাধিকারী নীতি আয়োগ) ও মন্ত্রকগুলির মাধ্যমে কেন্দ্র-রাজ্য হস্তান্তরের দিকটি এক সংযুক্ত কাঠামোর মধ্যে দেখার দিকে ফের জোর দিয়েছেন সিং ও শ্রীনিবাসন (২০১৩)। ভারতের রাজস্ব যুক্তরাষ্ট্রিকতা নিয়ে ইদানীংকালের আলোচনায় এ বিষয়টি বারংবার উঠে আসছে। বেশি কচকচির মধ্যে না ঢুকে সাদামাটাভাবে বলা যায়, হস্তান্তর তিন কিসিমের : অর্থ আয়োগ দ্বারা নির্ধারিত চলতি রাজস্ব, লগ্নির জন্য মূলধন হস্তান্তর

(আগে এটা ছিল যোজনা আয়োগের গণ্ডি), কেন্দ্রের অর্থানুকূল্যে চলা বা স্পনসর্ড প্রকল্প।

সিং ও শ্রীনিবাসনকে (২০১৩) অনুসরণ করে এখনও সওয়াল জোড়া যায়—(১) কেন্দ্রের অর্থানুকূল্যে চলা প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ ও পরিচালন বাবদ ব্যয়ের পুরো ভার কেন্দ্র নিক। এসব প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব কেন্দ্র বা রাজ্য যার হাতেই থাক না কেন, এখন এসব প্রকল্পে বিনিয়োগ খাতে খরচের আংশিক জোগায় কেন্দ্র। আর পরিচালন ব্যয় বহন করে একটা নির্দিষ্ট কাল ইস্তক। এর ফলে প্রকল্প শুরু হয়। সম্পন্নও হয়। কিন্তু একসময় পরিচালন ব্যয় রাজ্যের কাঁধে চাপলে প্রকল্পের সদ্ব্যবহার পুরোপুরি হয় না। কারণ, টাকা জোগাতে রাজ্যের ব্যর্থতা। কেন্দ্র টাকাকড়ির সব দায়িত্ব নিলে এই অপচয় রোখা যাবে। (২) কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের জন্য সরকারি বিনিয়োগ তহবিলের কাজ করবে নীতি আয়োগ। এর শেয়ারগ্রহীতা হবে কেন্দ্র ও রাজ্য। প্রস্তাবিত প্রকল্পের আর্থসামাজিক লাভালাভ এবং অর্থসংস্থানের সম্ভাব্যতা তহবিল খতিয়ে দেখবে।

তবে, নিজের ভূমিকা প্রসারিত করে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রিকতার অন্যান্য বহু বিন্যাস বা কাঠামো নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে নীতি আয়োগকে। ওয়াইনগাস্ট (১৯৯৩) মার্কেট প্রিজার্ভিং ফেডারালইজ্‌ম (বাজারে একটা দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা কতখানি হস্তক্ষেপ করতে পারে তার সীমা)-এর ধারণা প্রবর্তন করেন। ধারণাটি পাঁচটি বিষয় বা শর্ত দিয়ে বোঝা যায়—(১) নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত নির্দিষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্ন স্তরের সরকার (যুক্তরাষ্ট্রিকতার ভিত্তি), (২) স্থানীয় অর্থনীতিতে মূল কর্তৃত্ব আঞ্চলিক সরকারের, (৩) জাতীয় সরকারের এক্তিয়ারে থাকবে এক সাধারণ জাতীয় বাজার, (৪) আঞ্চলিক সরকারের বাজেটে কঠোর কড়াকড়ি এবং (৫) রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রাতিষ্ঠানিক বণ্টন। আগে, সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রিকতার ধারণায় (হুইয়ার, ১৯৫৩) জাতীয় ও আঞ্চলিক সরকারের একযোগে কাজ করা এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক কর্তৃত্ব থেকে পারস্পরিক মঙ্গলের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। একইভাবে, রাইকার (১৯৬৪)-এর চিন্তাভাবনায় যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির পক্ষে সাংবিধানিক আদানপ্রদান বা দর কষাকষি। এক বিকল্প ধারণায় আঞ্চলিক সরকারগুলি এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতাজনিত সুফলের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাদের কেন্দ্র বা এলাকার স্বার্থে কাজ করতে রাজনৈতিক নেতাদের উৎসাহ দিয়ে এই প্রতিযোগিতা দক্ষতা বাড়ায় (টাইবাউট, ১৯৫৬; ব্রেনান ও বুকানন, ১৯৮০; ব্রেটন, ১৯৯৫)। ব্রেটন আরও লক্ষ করেছেন সরকারগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। ঠেলে দিতে পারে অসমতার দিকে। তার মতে লাগামছাড়া প্রতিযোগিতা সবসময় শ্রেয় নয়। মার্কেট প্রিজার্ভিং ফেডারালইজ্‌ম (এম পি এফ) মাথা ঘামায় প্রতিযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রিকতা নিয়ে। তবে নানাভাবে, বিশেষত ৩য় ও ৪র্থ শর্তের বেলায় এর গণ্ডি ছাড়িয়ে যায়। সেইসঙ্গে ৩য় শর্তটি ছাড়া এই ধারণা ব্রেটন-এর চেয়ে প্রতিযোগিতার বিষয়ে বেশি আশাবাদী। বাজারের ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতায় রাশ টানা ও বিকেন্দ্রীকরণে এটা জোর দেয়। সিং (২০০৮) ভারত ও চীনে এসব ধারণার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ভারতের মতো যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শাসনের উৎকর্ষ বা মানের সাধারণ ইস্যুগুলি সরকারের শ্রেণিবিভাগের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলির সঙ্গে জড়িত। এম পি এফ-এর বক্তব্য, সুশাসন আছে ধরে নিলে, বাজারে সরকারের আনাড়ি হস্তক্ষেপে লাগাম কষা দরকার। আর এজন্য যথোপযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা প্রচলিত রীতিনীতি থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাজারমুখী সংস্কারের বিষয়ে শাসনের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট বিকেন্দ্রীকরণ অনুপূরক হতে পারে। এই সংস্কার সরকার ও বাজারের মধ্যে সীমারেখা নতুন করে টানে।

ভারতে শাসনের এক মৌল সমস্যা হচ্ছে দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত। কেউ বলতেই পারেন (রাও এবং সিং, ২০০৩) যে, ভারতের কেন্দ্রীকৃত গতানুগতিক দায়বদ্ধতা ব্যবস্থা অকেজো হয়ে পড়েছে। এখানে এ ব্যবস্থা চলে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও খবরদারিতে। শাসনদক্ষতা বাড়ানোর উপায় হিসেবে আঞ্চলিক স্তরে রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা আরও বেশি কার্যকর হবার মতো শক্তপোক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। এ ছাড়া, বাজারের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতায় সঠিক গণ্ডি বেঁধে দেবার দিকে এম পি এফ জোর দিয়েছে।

দক্ষতা বাড়ানোর জন্য সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ কিন্তু উচ্চ স্তরে যাবতীয় সরকারি তত্ত্বাবধান হঠানোর কথা বলে না। জাতীয় পর্যায়ে মঙ্গলজনক কিছু অধিকারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ এড়ানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে আঞ্চলিক স্তরের সে সংক্রান্ত ব্যবস্থার দিকে নজর দিতেই পারে। কিছু সরকারি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ মানে এ নয় যে, তা স্থানীয় হোমড়াচোমড়ারা কুক্ষিগত করে ফেলবে। বঞ্চিত হবে অন্যান্যরা। স্বাধীনতার পর এমনটিই আশঙ্কা ছিল। সিং ও শ্রীনিবাসন (২০১৩) শাসনে এহেন উন্নতির সম্ভাবনাকে গভর্ন্যান্স এনহানসিং ফেডারালইজ্‌ম (জি ই এফ)—শাসনের মানোন্নয়নকারী যুক্তরাষ্ট্রিকতা আখ্যা দিয়েছেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, নতুন নীতি আয়োগকে সতর্কতার সঙ্গে নিজের ভূমিকা ঠিক করতে হবে। দেখতে হবে, নেহাত দরকার ছাড়া ভারতের অর্থনীতিতে সরকারি হস্তক্ষেপ যেন করা না হয়। আয়োগ আঞ্চলিক সরকারের কর ক্ষমতা, সরকারি ব্যয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি, যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ এবং কেন্দ্র থেকে আঞ্চলিক সরকারের কাছে হস্তান্তরের বিষয় সংহত ও সুষ্ঠু করতে ফের চিন্তাভাবনা করার গোড়াপত্তন করতে পারে। এই ধারণামূলক সংস্কার কর্মসূচি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু অর্থনৈতিক বিকাশ বৃদ্ধি ও শাসনের মানোন্নয়নে তা খুবই কাজে লাগবে।❑

[লেখক ভারতের অর্থমন্ত্রীর জি-২০ সংক্রান্ত উপদেষ্টা গোষ্ঠীর সদস্য।
email: boxjenk@ucsc.edu]

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তি ও উন্নয়ন

শেখা এবং না শেখা

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর নির্মাণ, বৈশিষ্ট্য, নয়ের দশকে তার বাঁকবদল, সংস্কার, রাজনৈতিক যুক্তরাষ্ট্রীয়তার জায়গায় আর্থিক যুক্তরাষ্ট্রীয়তার ধারণা, সামনের চ্যালেঞ্জ—এককথায় তার সার্বিক চালচিত্র উঠে এসেছে এই নিবন্ধে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের জটিল সমীকরণের বিশ্লেষণও করেছেন **বলবীর অরোরা।**

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র গত ছয় দশকে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। এখানে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব সেই অভিজ্ঞতার চুম্বক বৈশিষ্ট্যগুলি—দ্বিধা, ভুল, ব্যর্থতা এবং একইসঙ্গে উদ্ভাবন, উদ্‌বৃত্ত ও সাফল্য। গত দু-দশকে এই অভিজ্ঞতায় সংযোজিত হয়েছে এক নতুন অধ্যায় : যুক্তরাষ্ট্রীয় জোটের যুগ।

এই অভিজ্ঞতার সূচনায় প্রথাগত বিবেচনার বহু নির্দেশ সরিয়ে রাখতে হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে সাংবিধানিক বিশুদ্ধতাবাদীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন। ঔপনিবেশিক একমুখী রাষ্ট্রের উত্তরাধিকার অগ্রাহ্য করে প্রথাবহির্ভূত পথে খুঁজে বেড়াতে হয়েছে নানা অভূতপূর্ব সমস্যার সমাধানসূত্র।

অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপরিহার্য অখণ্ডতাকে ক্ষুণ্ণ না করে ব্যবস্থাপনার পরিসরে কতটা বৈচিত্র্য অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব, এই সময়েই তা উদ্ভাবন করতে হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করতে হয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে কঠোর। তবে বিশ্বায়িত অর্থনৈতিক বিকাশের নব্য-উদার যুগে রাষ্ট্রের পশ্চাদপসরণের সঙ্গে একে এক করে দেখলে তা অতিসরলীকরণ হয়ে যাবে।

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারত, নাগরিকদের অর্থপূর্ণ অধিকার সুনিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত নিজেকে উন্নীত করার প্রয়াস চালিয়ে গেছে। এর টিকে থাকা এবং বিকশিত হতে পারার মূল কারণ হল এর যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো।

এই প্রবন্ধে আমরা ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করছি। দেখা যাক, এ থেকে কিছু শেখার আছে কি না।

যথাযথ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো নির্মাণ : বড় চ্যালেঞ্জ

বিশৃঙ্খল ঔপনিবেশিকতার অবসানে নবীন রাষ্ট্রের কাছে সব থেকে জরুরি ছিল সংহতিসাধন। গণপরিষদের পুরোধা ব্যক্তিত্বরা তাঁদের মূল উদ্দেশ্য নির্বাচনে ভুল করেননি। আদর্শ ও দূরদৃষ্টির সমন্বয়ে তাঁরা এক শক্তপোক্ত মজবুত গণতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।

তৎকালীন প্রেক্ষাপট ও সেই সময়কার কিছু দুঃখজনক ঘটনার জেরে ভারতকে একবাদী দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট চাপ ছিল। প্রবল বিতর্কের পর গণপরিষদ ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করে। সংখ্যালঘুদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে ব্যবস্থা করা হয় রক্ষাকবচের।

দেশভাগের জেরে নজিরবিহীন হিংসা, ভীতি এবং ছিন্নমূল মানুষের অসহায়তায় বিচলিত গণপরিষদ স্বাভাবিকভাবেই নতুন জাতির একতা ও অখণ্ডতা রক্ষায় মনোনিবেশ করে। অতিরিক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয়তাবাদ, কেন্দ্রাতিগ ও বিভাজনকামী শক্তিকে বর্জন করা হয়।

যে কাঠামো গ্রহণ করা হয়, তা তখনকার সব যুক্তরাষ্ট্রীয় মডেলের থেকে আলাদা ছিল। সময়ের চাহিদা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সমাজের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ রেখে গণপরিষদ একটি যথাযথ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলে। যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের যুক্তি মেনে যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সূচনা হয়, তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থাপনাকে পূর্ণতা দেয়।

সেই সময়কার অন্যান্য মডেলের সঙ্গে সাদৃশ্য না থাকায় এবং নির্দিষ্ট বিধিনিয়ম ও মাপকাঠির অভাবে নতুন এই ব্যবস্থাপনাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আখ্যা দেওয়া যায় কি না, তা নিয়ে গবেষকরা দ্বিধায় পড়েন। তাই একে 'অর্ধ যুক্তরাষ্ট্রীয়' ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এই ব্যাখ্যা আজ আর গ্রহণযোগ্য নয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিসমূহের শিকড় ভারতের মাটিতে প্রোথিত হয়ে গেছে। ভারতের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় ঘরানার সংকর উপাদান হিসেবে চিহ্নিত। স্বনিয়ন্ত্রণ ও সর্বজনগ্রাহ্য বিধিনিয়মের প্রথাবহির্ভূত সমন্বয় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে শুধু টিকিয়েই রাখেনি, এর বৈচিত্র্যকে বিকশিত হতে সাহায্য করেছে। গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ভারতকে সযত্নে এই মূল্যবান উত্তরাধিকার রক্ষা করতে হবে।

রাজ্য পুনর্গঠন প্রক্রিয়া : মাপকাঠি ও রাজনীতি

ভাষাগত পরিচয়ের ভিত্তিতে অঞ্চল গঠনের বিষয়টিকে গণপরিষদ বিশেষ গুরুত্ব দেয়। জাতীয় আন্দোলনের সময়ে প্রথম এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র স্থির ও জনপ্রিয়তা অর্জনের ভ্রান্ত পথে ঘুরে এর রূপায়ণ বিলম্বিত হয়।

সংবিধানে রাজ্য পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার নমনীয়তা দেখে অনেকেই আশ্চর্য হয়েছিলেন। বাস্তবে এর প্রয়োগ কীভাবে ঘটানো সম্ভব, সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন তাঁরা। এর উত্তর পেতে গেলে আমাদের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। তবে এই প্রক্রিয়ার রূপায়ণ যে কতটা কঠিন, সংঘর্ষ ও হিংসার মধ্যে দিয়ে তেলেঙ্গানার জন্ম তারই প্রমাণ।

স্বাধীনতার পর প্রথম দু-দশকের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করা যায় আত্মপরিচয় ও অভাবের রাজনীতির মিশ্রণ হিসেবে। আত্মপরিচয়, ভাষা ও সীমারেখা নিয়ে উত্তেজনা এই সময়কালের বৈশিষ্ট্য।

গণপরিষদ 'পরিবর্তনশীল রাজ্যসমূহের অপরিবর্তনীয় যুক্তরাষ্ট্র' গঠন করেছিল। কোনও রকম বিচ্ছিন্নতার ভাবনা নিষিদ্ধ করা হলেও সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে অন্যান্য আকারে সাংবিধানিক নমনীয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল।

নিতান্ত অনিচ্ছুকভাবে যার সূচনা, পরবর্তীকালে তা-ই এক সুদৃঢ় শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে রূপান্তরিত হয়। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এই রূপান্তরকে সম্ভব করে।

শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কাঠামোর স্থিতিস্থাপকতা

নব্য উদার চিন্তাধারা অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরোধী হলেও শক্তিশালী

কেন্দ্রীয় কাঠামোর অসাধারণ স্থিতিস্থাপকতা প্রমাণিত। নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে আনার অর্থ অনিয়ন্ত্রিত বিকাশ নয়। তাই পুরোনো রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির স্থান নিয়েছে নতুন স্বাধীন নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা। তবে এই স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে গণতান্ত্রিকভাবে দায়বদ্ধ করে তোলা হয়নি, তা অন্য বিষয়।

ম্যাক্রো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের হাতে। কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে আনার ফলে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের সুযোগ আরও বেড়েছে। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়নি, বরং আরও নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়েছে।

ভারতের সামাজিক বৈচিত্র্যের প্রকৃতি ও ব্যাপকতার সাপেক্ষে সামাজিক মেলবন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখতে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র অপরিহার্য ছিল।

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উন্নয়নের প্রথম পর্বে প্রাতিষ্ঠানিক সত্তাগুলির চমকপ্রদ বিকাশ লক্ষ করা যায়। সহযোগিতা ও সমন্বয়ের কেন্দ্র হিসেবে এগুলি কাজ করে। একটি রাজনৈতিক দল এককভাবে ক্ষমতায় থাকায় চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা আরও সহজ হয়। রাজ্যগুলির স্বশাসনের পক্ষে গলা ফাটানো অত্যন্ত গোঁড়া সমর্থকরাও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানানোর কথা ভাবেননি। তাঁরা কেন্দ্রীয় কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে রাজ্যের হাতে আরও ক্ষমতা দেওয়ার দাবি তুলেছিলেন।

এখানে বলা দরকার, সাবেক কাঠামোয় উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতির জন্য রাজ্যগুলির হাতে যথেষ্ট আইনি ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ভারতীয় সংবিধানের কেবল আক্ষরিক অর্থ ধরলে অবশ্য বিষয়টি স্পষ্ট হবে না। সেখানে বহু ক্ষেত্রেই রাজ্যের বিচার্য ক্ষেত্রগুলির ওপর কেন্দ্রকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় প্রকল্প ও জাতীয় মিশনের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। তৃতীয় তালিকার ২০তম বিষয় হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। এটিই প্রথম পর্বের পরিকল্পিত উন্নয়ন মডেলের সাংবিধানিক ভিত্তি।

ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভাগাভাগির ক্ষেত্রে নতুন কিছু বিষয় এখন গুরুত্ব পাচ্ছে। আগেকার সময়ে যে বিষয়গুলি নিয়ে সংস্কারের দাবি তোলা হত, তা এখন খানিকটা চাপা পড়ে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা ও দায়িত্বের বণ্টন নিয়ে বিবাদ সাধারণ ঘটনা। তবে এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব খুব বেশি হলে মারাত্মক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনা না করে প্রায়শই কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ও নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কর্মপরিকল্পনা স্থির করে ফেলে তারপর কেন্দ্র রাজ্যগুলির মতামত চায়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে না হয়ে ঐকমত্য স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর। রাজ্যগুলির অধিকার সুনিশ্চিত করতে গেলে শুধু আলোচনা করলেই হবে না, প্রয়োজন আরও সক্রিয় সর্বাত্মক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া।

রাজ্যগুলির মধ্যে যে অসাম্য রয়েছে, তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়ে এমন এক রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত, যেখানে অখণ্ডতাকে ক্ষুণ্ণ না করে বা অভিন্নতাকে চাপিয়ে না দিয়ে এই বৈচিত্র্যকে রক্ষা করা সম্ভব।

অসামঞ্জস্যপূর্ণ যুক্তরাষ্ট্রীয়তার ধারণায় আদানপ্রদান ও অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র জড়িত। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য যত বেশি করে সামনে আসে, ততই এ সংক্রান্ত বিধিসম্মত ব্যবস্থাপনার দাবি জোরালো হয়।

ভারতে রাজ্যগুলির মধ্যে, এমনকি একই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেকার অসাম্য অসন্তোষ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে। বিশেষ মর্যাদা দান, বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধা ও সহায়তার মতো পদক্ষেপ সমস্যার সমাধানে অনেকটা সহায়ক হয়।

ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধানেও বিশেষ মর্যাদা দানের সংস্থানটি ব্যবহার করা হয়। সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৭১ ধারার প্রয়োগ এর নিদর্শন।

রাজ্যের আওতায় স্বশাসনিক কাঠামো, স্বশাসিত জেলা পরিষদ প্রভৃতির ফলাফল মিশ্র। এর জেরে কিছু ক্ষেত্রে বিক্ষোভ প্রশমিত হয়, আবার কিছু ক্ষেত্রে পৃথক রাজ্যের দাবি জোরদার হয়ে ওঠে।

আর্থিক যুক্তরাষ্ট্রীয়তা : নতুন মন্ত্র

উদারীকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ হ্রাস রাষ্ট্রকে কি আরও শক্তিশালী করে? নাকি দুর্বল করে তোলে? পরিবর্তিত এই দর্শন কি রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার গুরুত্ব কমিয়ে দিচ্ছে? 'রাষ্ট্রের অধিকার'-এর নতুন ভাবনা কি রাজনৈতিক স্বশাসন থেকে অর্থনৈতিক শক্তিমুখী? এই প্রশ্নগুলির উত্তর এখনও খুব স্পষ্ট নয়।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে প্রথমেই রাজনৈতিক সংহতি স্থাপনের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল। অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ম্যাক্রো অর্থনৈতিক বিষয়গুলির ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকায় সাধারণ বাজার গড়ে তোলাকে ভাবা হয়েছিল অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ।

কিন্তু অর্থনৈতিক যুক্তরাষ্ট্রীয়তায় ক্রমশ বেড়ে চলা অসাম্য এই সংহতিসাধনের পথে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। রাজ্যগুলিকে ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়। আন্তঃরাজ্য শুল্ক থেকে উপার্জিত অর্থের ভাগ যাতে তারা কেন্দ্রকে দেয়, সেজন্য জটিল ও দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

নয়ের দশকের গোড়ায় উদারীকরণ ও বাজারশক্তির ক্রমবর্ধমান ভূমিকায় ভারতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এ থেকে জন্ম নেয় নতুন বৈপরীত্য ও দলভেদ।

আগে রাষ্ট্রই উদ্যোগী হয়ে এই ধরনের অসন্তোষ মিটিয়ে দিত। বাজারের আওতার বাইরে থেকে যাওয়া মানুষজনকে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের নীতি ও প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হত।

আয়গত অসাম্যের পাশাপাশি বিপুল আঞ্চলিক অসাম্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রেও সমস্যার সমাধানে রাষ্ট্র আগে সক্রিয় ভূমিকা নিত। বর্তমান পরিস্থিতি মূলত দুটি উপাদানের সংমিশ্রণের ফল। অর্থনৈতিক উদারীকরণ সংস্কার কর্মসূচি এবং দলীয় ব্যবস্থার যুক্তরাষ্ট্রীয়করণ। ক্রমশ বেড়ে চলা অসাম্যের সমস্যাটিও একইরকম জটিল। এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্যকে রাষ্ট্র তার নতুন ভূমিকায় কীভাবে সামলাবে, সেটাই বিতর্কের মূল বিষয়।

প্রস্তুতি ও সামর্থ্যে ফারাক থাকলেও রাজ্যগুলি এখন লগ্নি টানতে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এর জেরে জন্ম হয়েছে প্রতিযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয়তার, যদিও রাজ্যগুলিকে এক সমতলে নিয়ে আসার কাজ এখনও বাকি।

বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে রাজ্যগুলির এই প্রতিযোগিতাকে দুটি দিক থেকে দেখা যেতে পারে। একদিকে, সুশাসন ও সুচারু আর্থিক ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করতে রাজ্যগুলির ওপর চাপ বাড়ছে। অন্যদিকে, বেশ কিছু সংস্কার প্রক্রিয়ার নেতিবাচক প্রভাব যে তাদের ভোটবাক্সের ওপর পড়তে পারে,

তা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলিকে সজাগ থাকতে হচ্ছে।

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় হল শাসনগত যুক্তরাষ্ট্রীয়তার বিকাশ। উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্পের সঙ্গে দেশের আমলাতন্ত্রেরও বিকাশ ঘটেছে। ক্ষমতায়ন ও অন্তর্ভুক্তিকরণের বদলে এখন মূল জোর দেওয়া হচ্ছে প্রকল্প রূপায়ণের ওপর। প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেও সেই মতো পরিবর্তন আনা হয়েছে।

স্থানীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার মর্যাদা : নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপান্তরের ক্ষেত্রে নয়ের দশক এক মাইলফলক। এই সময় থেকেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা আরও বেশি করে যুক্তরাষ্ট্রীয় হয়ে উঠতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় জোট সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের নতুন নতুন রাস্তা খুলে দেয়।

রাজ্যভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলি জাতীয় নীতি প্রণয়ন এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ওপর তাদের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। প্রথাগত প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে যা সম্ভব হত না, যুক্তরাষ্ট্রীয় জোট আঞ্চলিক শক্তিগুলির কাছে সেই সুযোগ এনে দিয়েছে।

এই রূপান্তরের নেপথ্যে দুটি মূল চালিকাশক্তি রয়েছে। প্রথমত, উদারীকরণের জেরে রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। অর্থনৈতিক সংস্কার রাজ্যগুলির জন্য নতুন ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করেছে। দ্বিতীয়ত, তার নিজস্ব 'প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক যুক্তিমিশ্রণ' নিয়ে দলব্যবস্থার যুক্তরাষ্ট্রীয়করণ এক নতুন গতির সঞ্চার করেছে।

রাজ্যভিত্তিক দলগুলির মাধ্যমে স্থানীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার উজ্জীবন এবং অন্যতর প্রেক্ষিতে জাতীয় সংহতি—এই দুইয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। বহুস্তরীয় এই সম্পর্কের জেরে ক্ষমতা ভাগাভাগির যে জটিল তত্ত্বের জন্ম—সমগ্র ব্যবস্থাকে একসূত্রে গেঁথে রাখার ক্ষেত্রে তা এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

এই সময়ের আর-একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, স্থানীয় স্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্ষমতা প্রদান। ৭৩তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে একে আইনি রূপ দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর তৃতীয় স্তর হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়েছে এটি (১৯৯২-৯৫)।

কিন্তু তাই বলে আমরা যে বহুস্তরীয় যুক্তরাষ্ট্রীয়তার স্বর্গে বাস করছি অথবা অদূর ভবিষ্যতে তেমনটা হবার সম্ভাবনা রয়েছে, তা জোর দিয়ে বলা যায় না। রাজ্য স্তর, রাজনৈতিক বৃত্ত ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে থাকা বেশ কিছু প্রভাবশালী মহল নিজেদের কায়েমি স্বার্থে এই বিকেন্দ্রীকরণের বিরোধিতা করছে।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ এবং নাগরিক সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে যৌথ কর্মপ্রয়াস যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর ফলে যে সচেতনতা ও চাপের সৃষ্টি হয়েছে, তা ভবিষ্যতে আরও সংহত হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় আরও পরিবর্তন আনবে।

নতুন সহস্রাব্দের চ্যালেঞ্জ

নতুন সহস্রাব্দে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, এবার তা দেখা যাক। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, 'ক্ষমতা ও প্রভাব এখন কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলির রাজধানীতে এবং তারপর উপ-অঞ্চল, জেলা ও পঞ্চায়েতের মতো তৃণমূল স্তরের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে।' এই পর্যবেক্ষণ কি সত্য? এর স্বপক্ষে আঞ্চলিক ও জাতপাত-ভিত্তিক দলগুলির উল্লেখযোগ্য সাফল্য এবং দেশের বহু জায়গায় পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি ওঠার বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা সমসাময়িক প্রবণতার সাপেক্ষে এই পর্যবেক্ষণকে একটু বিশ্লেষণের চেষ্টা করি।

ভারতের মতো বহুমাত্রিক সংস্কৃতির দেশে সাংস্কৃতিক অসহিষ্ণুতা বেড়ে চালর প্রবণতা অত্যন্ত বিপদজনক। প্রধানত দুটি ক্ষেত্র এখনও অমীমাংসিত।

প্রথমত, আত্মপরিচয় সংক্রান্ত প্রশ্ন : দ্বিতীয় রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন স্থাপন এবং আন্তঃসীমা পুনর্বিন্যাসের দাবি ইতিমধ্যেই উঠেছে। গঠিত হয়েছে তেলেঙ্গানা রাজ্য। বিদর্ভ রাজ্য গঠন ও উত্তরপ্রদেশের পুনর্গঠনসহ বিভিন্ন ইস্যু এখনও সজীব। দ্বিতীয়ত, সম্পদ সংক্রান্ত অস্থিরতা : জলসম্পদ, দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা জলবণ্টন সমস্যা (কাবেরী, নর্মদা) এবং পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলির জন্য ক্ষতিপূরণের অঙ্ক নিয়ে বিবাদ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৃহত্তর স্বশাসন এবং সম্পদের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণের দাবি।

এ ছাড়া অর্থনৈতিক সম্পদের পুনর্বণ্টন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজানোর বিষয়টিও নতুন সহস্রাব্দে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সংস্কারে স্থান পেতে পারে। কর বাবদ আয়ের সিংহভাগ কেন্দ্র নিয়ে নেওয়ায় এ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার সংস্কারের দাবিও উঠেছে।

কেন্দ্রে জোট সরকার গঠন ও আঞ্চলিক দলগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতিফলন পড়েছে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কেও। যুক্তরাষ্ট্রীয় জোটের মাধ্যমে আঞ্চলিক দলগুলি জাতীয় স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে, যা অধুনালুপ্ত যোজনা কমিশন, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ বা আন্তঃরাজ্য পরিষদের মতো প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে এর আগে কখনও পাওয়া যায়নি।

এর পাশাপাশি জাতীয় নীতি প্রণয়নে রাজ্যগুলির অংশগ্রহণ আরও বাড়াবার নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন এবং বিদ্যুৎ, সড়ক, মৌলিক নাগরিক পরিষেবার মতো মূলগত পরিকাঠামো ক্ষেত্রে গৃহীত প্রকল্পগুলির কার্যকর রূপায়ণে তাদের উদ্‌বুদ্ধ করে তোলা আর-এক চ্যালেঞ্জ। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এই লক্ষ্য অর্জনে কিছুটা সফল হলেও কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার বিকল্প আর কিছুই হতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রে শাসনব্যবস্থায় বহুতর পরীক্ষানিরীক্ষা করার সংস্থান রয়েছে, তবে এগুলিকে অবশ্যই সংবিধানের মূল নীতি ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এখনও পর্যন্ত প্রশাসনিক পদ্ধতি ও কৌশলের সীমিত পরিসরে এই ধরনের পরীক্ষা আংশিক সফলতা পেয়েছে। স্কুলগুলিতে মিড ডে মিল ব্যবস্থা, নগর জমি মূল্যায়ন পদ্ধতির মতো বেশ কিছু ব্যবস্থার সুফল রাজ্যগুলি পাচ্ছে।

কিন্তু পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে উন্নয়নের বিকল্প পথ খোঁজার যে প্রয়াস রাজ্যগুলি চালাতে পারে, কেন্দ্রীভূত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো তাতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। আরও উদ্‌বেগের বিষয় হল, আঞ্চলিক দলগুলি কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসে জাতীয় দলগুলিরই প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ, তাদের কাছে দেওয়ার মতো প্রকৃত অর্থে কোনও বিকল্প নেই।

বর্তমানে রাজনৈতিক পরিসরে সহযোগিতা-মূলক যুক্তরাষ্ট্রীয়তা, প্রতিযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয়তার মতো নানা শব্দ খুব শোনা যাচ্ছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর নির্যাস আসলে রয়েছে রাজ্য ও জেলাগুলির মধ্যে। যতদিন না এই স্তরে প্রকৃত পরিবর্তন হচ্ছে, ততদিন ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রকে সংহত করার কাজ অসমাপ্তই থেকে যাবে।❑

[লেখক চেয়ারম্যান, সেন্টার ফর মাল্টিলেভেল ফেডেরালইজ্‌ম, ইন্সটিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেস এবং জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক প্রাক্তন অধ্যাপক।]

বৈচিত্র্যের উদ্‌যাপন

ভারতবর্ষের সাফল্যের মূলমন্ত্র

এ বিশ্ব বৈচিত্র্যময়। দ্রুত বিশ্বায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এক দেশ থেকে অন্য দেশে মানুষের অবাধ যাতায়াতের ফলে একাদশ শতকে বহুসংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজের বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। বিভিন্ন ভাষাভাষী, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর বৈচিত্র্যগুলির বিনাশ নয়, বরং এগুলিকে লালন করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। আর তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই হল সবচেয়ে উপযুক্ত। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই পারে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সুর বেঁধে রাখতে। যেমন পেরেছে ভারত। মহাদেশসম এ দেশের বিপুল বৈচিত্র্যের মাঝে কীভাবে সফল হল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা? লিখছেন **অ্যাশ নারায়ণ রায়।**

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রীয় তত্ত্বের এক নবজাগরণ ঘটছে। গত দুই দশক বা তার কিছুটা বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রবাদের একটা পুনরুজ্জীবন লক্ষ করা যাচ্ছে। অর্থাৎ এই সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপরই ভরসা করা হচ্ছে। জোট সরকার জমানায় ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নীতি আরও গভীরভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। বেলজিয়ামের মতো দেশ পূর্ণাঙ্গ যুক্তরাষ্ট্র হয়ে ওঠার জন্য সংবিধান পর্যন্ত সংশোধন করেছে। বর্ণবৈষম্য পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানে কিছু যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তী কোনও কারণে সেগুলি লঘু করে দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রবাদ দক্ষিণ আফ্রিকার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে বলে আশা করা যায়।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, স্থানীয় প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে ক্ষমতার হস্তান্তরের মতো বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এককেন্দ্রিক ও অযুক্তরাষ্ট্রীয় দেশগুলিও (যেমন, স্পেন ও ব্রিটেন) বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় নিয়মকানুন অনুসরণ করছে। উপসাগরীয় দেশগুলির অর্থচালিত আধা সমাধানের নীতি এই অঞ্চলে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করলেও ইয়েমেন জাতীয় আলোচনা চক্রের (ন্যাশনাল ডায়লগ কনফারেন্স) মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি গ্রহণ করেছে। ইরাক, নেপাল, দক্ষিণ সুদান এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশও যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছে। যুক্তরাষ্ট্র হয়ে উঠতে আগ্রহী কোনও কোনও দেশ এমন দৃষ্টান্ত রেখেছে, যা মোটেই অনুসরণযোগ্য নয়; তা সত্ত্বেও এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে—এই সময় যুক্তরাষ্ট্রেরই সময়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে কেন একটা আন্তর্জাতিক মাত্রা জড়িয়ে থাকে? বিশ্ব জুড়ে আজ যুক্তরাষ্ট্রবাদের যে নতুন আবেদন, তার উৎস নিহিত রয়েছে এই ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মূল্যবোধে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই নাগরিকরা ঐক্যের মধ্যেও তাদের বৈচিত্র্য বজায় রাখতে পারেন। জাতিগত, ভাষাগত এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা তাঁদের নিজস্ব পরিচয় নিয়ে বাঁচতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসন তথা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তৃণমূল স্তরের অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করে।

যুক্তরাষ্ট্রবাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির আর-একটি অন্যতম কারণ হল এর নমনীয়তা—নতুন নতুন পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে এর মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুসরণকারী ২৫টি দেশের মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু ক্ষমতা বণ্টন, সরকারের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আর্থিক দায়দায়িত্ব বণ্টন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে এগুলির মধ্যে বিরাট পার্থক্য। তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার ওপর আদৌ যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে না। এটা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর।

তাই এক্ষেত্রে অবশ্যই কোনও অভিন্ন আদর্শ বা মডেল নেই। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে যুক্তরাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। একটি দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাফল্যের ফর্মুলা অন্য একটি দেশে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবে একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তোলার সময় অবশ্যই একটি 'মডেল'-এর রূপরেখা তৈরি করতে হবে। অবশ্যই হঠাৎ করে কেউই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আবিষ্কার করে ফেলতে পারে না। সংঘর্ষপরবর্তী সমাজগুলিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা মুখের কথা নয়। যথেষ্ট কঠিন কাজ। প্রকৃতির মতোই এটা ঘটে যায়। একে লালন করতে হয়। একে মজবুত করতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রবাদ কোনও দর্পণ নয় যেখানে বাস্তবের প্রতিচ্ছবি পড়বে, বরং তা বাস্তবকে তৈরি করবে। যুক্তরাষ্ট্র সময় বিশেষে মানুষকে ভালো হতে, সু-আচরণ করতে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু অন্য অর্থে এটা এক অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপও বটে। তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে তা

এই নতুন কাঠামোকেই আরও অনেক স্থিতিশীল করে তুলবে এ সম্ভাবনা প্রবল।

বৈচিত্র্যের উদ্‌যাপন

আমাদের ব্রহ্মাণ্ড বৈচিত্র্যময়। বৈচিত্র্যই আমাদের জীবনের মূল রসদ। অমর্ত্য সেনের ভাষায় প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পরিচয়ক্রমে 'মানব পরিচয়কে তুচ্ছ' করে 'মানব জাতির ক্ষুদ্র সংস্করণ'-এর রূপ নিচ্ছে। আবার এই বৈচিত্র্যই আজ বিশ্ব জুড়ে অসন্তোষ, হিংসা, এমনকি সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিচ্ছে।

বৈচিত্র্য এক সম্পদ, কোনও দায় নয়। বৈচিত্র্য কিন্তু কোনও বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে না, বরং যথাযথভাবে চালিত করা গেলে বৈচিত্র্যই হয়ে হয়ে উঠতে পারে দেশের শক্তি। বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা একটি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারে। রাষ্ট্র এক, কিন্তু জাতির মধ্যে রয়েছে বহুত্ব। বৈচিত্র্যের মধ্যেই রয়েছে একটি দেশের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাওয়ার শক্তি। বৈচিত্র্যই বিভিন্ন উদ্ভাবনের প্রেরণা।

একাদশ শতকে বহুসংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজের বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিতেই হবে। দ্রুত বিশ্বায়ন, চটজলদি যোগাযোগ, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মানুষের পাড়ি জমানোর প্রবণতা এবং সেইসঙ্গে নানারকম ধ্যানধারণার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা পরিষ্কার যে, আগামী দিনে এই গ্রহ অসমসত্ত্ব জনগোষ্ঠীতে ভরে যাবে—যারা কেউ কারও মতো নয়। এটাই হবে এই বিশ্বের পরিবর্তিত মুখ। অধ্যাপক ভিক্ষু পারেখের মতে, 'সংস্কৃতিগত সমসত্ত্ব সমাজের সদস্যরা যান্ত্রিকভাবে একই বিশ্বাস এবং রীতিনীতি অনুসরণ করছে আজকের দিনে এই ধারণা নৃতত্ত্বের গল্পগাথা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

মানুষের অবাধ চলাচল ও বিশ্বায়নের ফলে যুক্তরাষ্ট্রবাদ এক নতুন জীবন পেয়েছে। তা ছাড়া, বহুসংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজগুলি যদি সহাবস্থানের মন্ত্র না শেখে তবে ফল হবে মারাত্মক। তবে এর অর্থ এই নয় যে,আমাদের সময়ের আগে বহুসংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজের অস্তিত্ব ছিল না।

রোমান সাম্রাজ্যে, মধ্যযুগীয় ভারত এবং অটোমান সাম্রাজ্যের মতো অনেক প্রাক্-আধুনিক সমাজেই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের অস্তিত্ব ছিল। অনেক সমাজেই ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী বহুকাল ধরে পাশাপাশি বসবাস করেছে। আবার অনেক সমাজে, সাম্প্রতিক অভিবাসনের জোয়ারের ফলস্বরূপ সাংস্কৃতিক ভিন্নতা এসেছে। কোনও দেশে বিশেষ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলি কোনও বিশেষ স্থানের অধিবাসী, কোনও দেশেও আবার সেটা নয়। কোনও দেশে বহুসংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজগুলির মধ্যে শান্তি, সম্প্রীতি বজায় রয়েছে। আবার কোনও কোনও দেশে তাদের একে অপরের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ বেঁধেছে।

অনেক সমাজ তাদের বৈচিত্র্যকে আড়াল করতে চেয়েছে এবং সেই বৈচিত্র্যের অন্তর্নিহিত বিষমসত্ত্ব চরিত্রকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। আবার কোনও কোনও সমাজ জনগোষ্ঠী বিনিময়ের মাধ্যমে বিষমসত্ত্ব চরিত্রের অবসান ঘটাতে চেয়েছে। আবার কোনও সমাজ এর জন্য মহামিলন অর্থাৎ কিনা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীকে মিলিয়ে-মিশিয়ে একাকার করে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছে। কিন্তু স্বশাসন ও অংশীদারিত্বমূলক শাসনের এক যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে বৈচিত্র্যকে বজায় রাখাই এক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়। কারণ বৈচিত্র্যের উদ্‌যাপনই একটি সমাজ ও জাতিকে মজবুত করে।

বহুসংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজগুলির কাছে সবচেয়ে ভালো বিকল্প হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে বৈচিত্র্যের মধ্যে যেভাবে ঐক্যের সুর ধ্বনিত হয়, তাতে বহুসংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজগুলি শ্যাম, কুল দুই-ই রাখতে পারবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় দেশের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠের মর্যাদা পেতে পারে। এখানে বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম এবং সংস্কৃতি স্বীকৃতি পায়, সমাদরে গৃহীত হয়। এই শাসনব্যবস্থা বৈচিত্র্যকে সম্মান দেয়, মূল্য দেয়। এই শাসনব্যবস্থা বৈচিত্র্যের প্রসার ঘটিয়ে বৈচিত্র্যের সুফলগুলিকে ধরে রাখতে পারে।

বহুত্ববাদের অনন্য দৃষ্টান্ত ভারত

কোনও জাতি ও সমাজ হিসেবে কারও কোনও তকমার সঙ্গে ভারতের উদাহরণ ঠিক মেলে না। ইউ আর অনন্তমূর্তি যেমন কিনা বলেছিলেন, ভারতে একজন মানুষ একই সঙ্গে দ্বাদশ ও একবিংশ শতকে বাস করেন—কিংবা এর মাঝের সব শতকে। ভারতের চরিত্র এত জটিল যে এককথায় তা প্রকাশ করা অসম্ভব। এ দেশের শতাব্দীপ্রাচীন ইতিহাস এবং এর বহুমুখী বৈচিত্র্যের জন্যই এ দেশকে এতভাবে দেখা হয়, এতভাবে বিচার করা হয়। স্বনামধন্য মার্কিন লেখক মার্ক টোয়েন ১৮৯৬ সালে ভারত ভ্রমণকালে বলেছিলেন, 'ঈশ্বর বা মানুষ যা যা করতে পারে এই ভূমিতে ঠিক তাই তাই হয়েছে।'

মানুষজন, সংস্কৃতি, ভাষা এবং ধর্মীয় বৈচিত্র্যের এক চমকপ্রদ সমাহার ঘটেছে এ দেশে। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি ছাঁচে ফেলা কোনও অনড় নিয়ম নয়; সময়কালের গণ্ডিতেও এগুলি আবদ্ধ নয়। আর এখানেই ভারতের দৃষ্টান্ত অনন্য। তবে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের স্বতন্ত্র পরিচয় ও ধ্যানধারণা রয়েছে এবং এগুলি সামাজিক শূন্যতার মধ্যে লালিত হতে পারে না। শুধু সংখ্যার বিচারেই যে ভারতের বৈচিত্র্য অনেক তা নয়, এগুলি জীবন্ত এবং দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

বিখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ই পি থমসনের মতে, 'ভারত সম্ভবত আগামী বিশ্বের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশ। হিন্দু, মুসলিম, ধর্মনিরপেক্ষ, স্ট্যালিনপন্থী, উদারপন্থী, মাওবাদী, গণতান্ত্রিক সমাজবাদী, গান্ধীবাদী—বিশ্বের সমন্বয়কারী সব প্রভাব এই সমাজে প্রবাহিত। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের এমন কোনও চিন্তা নেই যা কোনও ভারতীয় মনে সক্রিয় নয়।' ভারত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এক অনন্য নিদর্শন। এটা এমন এক সমাজের নিদর্শন যেখানে বৈচিত্র্যের উদ্‌যাপন আধুনিক জাতির বন্ধনকে আরও মজবুত করেছে। এ দেশের অনন্য বৈচিত্র্যের টানে যুগে যুগে কালে কালে কত না দেশ থেকে দলে দলে মানুষ এখানে ভিড় করেছেন। ভারতের জনসাধারণের মধ্যে কত না জাতিগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। বেশিরভাগ স্থানেই যেখানে প্রধান মানব সংস্কৃতি অন্যান্য সংস্কৃতির আত্তীকরণে বা অপসারণে উদ্যত হয়েছে,

তখন ভারত বৈচিত্র্যের লালনে উৎসাহ দিয়েছে।

সংস্কৃতি শুধুমাত্র অতীতের ঐতিহ্য, প্রথা বা রীতিনীতি বজায় রাখার মাধ্যম নয়। বিভিন্ন সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষার মধ্যেকার বৈচিত্র্যও এক ধরনের মূল্যবোধ, যা সমাজগুলিকে লালন করতে হয়। প্রকৃত বৈচিত্র্যের মধ্যেই যুক্ত থাকেন আরও বেশি অংশীদার, নিহিত থাকে আরও বেশি উদ্দীপনা এবং আরও বেশি ক্ষমতায়ন। ভারত একটি বহুত্ববাদী সমাজ এবং একটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতি। টি এন মদনের মতে, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা নিহিত রয়েছে তার বহুত্ববাদে। ইশাইয়া বার্লিন বলেছেন, 'বহুত্ববাদ এমন একটি ধারণা যে মানুষজন বিভিন্ন স্বার্থপূরণ করতে চেয়েও পুরোপুরি যুক্তিসংগত এবং মানুষ থাকবে, তারা একে অপরকে বুঝতে সক্ষম হবে, সহানুভূতিশীল হবে এবং একে অপরের কাছ থেকে আলো পাবে। শুধুমাত্র যে বিষয়টি মানুষকে মানবিক করে তোলে সে বিষয়টি বিভিন্ন সংস্কৃতির কাছে অভিন্ন বলে এবং তা সংস্কৃতিগুলির মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে বলে সময় ও কালে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ সম্ভবপর হয়েছে (ইশাইয়া বার্লিন, দ্য প্রপার স্টাডি অফ ম্যানকাইন্ড, ১৯৯৭)।'

আত্তীকরণ এবং মিলিয়ে-মিশিয়ে দেওয়া বা 'মেল্টিং পট মডেল'-কে স্বীকার করেনি ভারত। তার বদলে এ দেশ 'স্যালাড পাত্র' বা 'গ্লোরিয়াস মোজাইক' মডেলকেই বেছে নিয়েছে, যেখানে প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠী/ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারবে। মহাত্মা গান্ধীর সেই বিখ্যাত উক্তির মধ্যেই ভারতের 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের' মূল সুর ধরা পড়েছে—"আমার ঘরের চারপাশ উঁচু দেওয়াল দিয়ে রুদ্ধ করতে এবং সমস্ত জানালা বন্ধ করে দিতে আমি চাই না। আমি চাই দেশ-দেশান্তরের সংস্কৃতি মুক্ত বাতাসের মতো আমার ঘরে খেলা করুক। কিন্তু সেই বাতাসে আমি যেন কোনওভাবেই না দিশা হারাই (এস কপস্, 'অন দ্য কালচারাল র‍্যামপার্টস্' ইনটারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন, ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৮)।"

বৈচিত্র্যই ঐক্য

একটা সময় ছিল যখন সদ্য স্বাধীন দেশগুলির অব্যর্থ মন্ত্র ছিল 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'। সমস্ত সভায়, অনুষ্ঠানে বারবার শুধু ছিল একই কথার একঘেঁয়ে পুনরাবৃত্তি। কোনও কোনও দেশ তো আবার এই শব্দবন্ধটিকে তাদের সংবিধানেও স্থান দিয়েছে। পরে এল আরও লাগসই শব্দবন্ধ 'বৈচিত্র্যের মাধ্যমে ঐক্য'। আর ভারত যে আদর্শ স্থাপন করেছে তাকে শুধুমাত্র একটি শব্দবন্ধেই প্রকাশ করা যায় 'বৈচিত্র্যই ঐক্য'। ভারত শুধু বিভিন্ন সংস্কৃতি, ধর্ম ও ভাষার বৈচিত্র্যকে মূল্যই দেয়নি বরং তাকে সযত্নে লালন করেছে। সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি, চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণার নিয়মিত আদানপ্রদান এ দেশে এক অনন্য সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ও সমন্বয় ঘটিয়েছে।

যদি বলা হয়, ভারতের সাফল্যের চাবিকাঠিটা কী? ভারতের গণতান্ত্রিক শাসনকাঠামোর ভিত্তি যুক্তরাষ্ট্রীয়। ভারতের বিশালায়তন এবং অভূতপূর্ব বৈচিত্র্যসম্পন্ন দেশের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোই জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের পক্ষে আদর্শ বলে চিহ্নিত হয়েছে। এই ব্যবস্থাই বহুত্ববাদ বা বৈচিত্র্যময় সমাজের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি সংরক্ষণের পক্ষে উপযুক্ত। কোনও জনসম্প্রদায়ই এ দেশের প্রভু নয়—এই বিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ভারতের সাফল্যের মূলমন্ত্র। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় গান্ধীজি একবার বলেছিলেন যে, "বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও কোনও গোষ্ঠী আলাদা করে বিশেষ সুবিধা পাবে না...এবং ধর্মীয়, ভাষাগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে সংখ্যাগরিষ্ঠের কর্মকাণ্ড থেকে রক্ষা করা হবে।" তাই 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' শব্দবন্ধটি নিছকই একটি স্লোগান বা কথার কথা নয়, বরং গণতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সহিষ্ণুতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এক জীবনাদর্শ। সেই সূচনাকাল থেকে ভারতীয় সভ্যতায় এক বহুত্ববাদী চরিত্র লক্ষ করা যায়। বৈদিক যুগে ভারতীয় সভ্যতায় যে বহুত্ববাদী এবং সংমিশ্র ভাবধারার বিবর্তনের শুরু, তা বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদের হাত ধরে পরিপুষ্ট হয়ে মধ্যযুগের গোড়ার দিকে ভক্তি আন্দোলনের রূপ নিয়ে আরও মজবুত হয়ে দিগন্তরেখা ছুঁয়েছে।

মেক্সিকোর নোবেল পুরস্কারজয়ী লেখক অক্টাভিও পাজ একটা সুন্দর কথা বলেছেন। ভারতে বিভিন্ন সংস্কৃতির অভূতপূর্ব মেলবন্ধন দেখে চমৎকৃত হয়ে তিনি বলেছিলেন , 'হিন্দু এবং ইসলাম—এই দুই সভ্যতা একই ভূমিতে অবস্থান করছে, নাকি একই সভ্যতা দুই ধর্মকে লালন করছে, এটা বলা অসম্ভব।" কিন্তু ভারত সত্যিই এক বিস্ময়। এখানকার শাসনকাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয়। সেইসঙ্গে এটি একটি বহুত্ববাদী সমাজ। বহুত্ববাদী সমাজ হওয়া আর যুক্তরাষ্ট্র হওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রেও বহুত্ববাদী সমাজ থাকতে পারে। ক্ষমতার হস্তান্তর তথা বিকেন্দ্রীকরণ এবং সমস্ত নাগরিকের জন্য মৌলিক অধিকারগুলির সুনিশ্চিতকরণই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রেখেছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও বহুত্ববাদী সমাজের মূল নীতিগুলিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ওপরই ভারতের এই সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করেছে—এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

ভাষা ও সংখ্যালঘুর অধিকার

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারসহ নাগরিকদের অন্যান্য মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য সাংবিধানিক সুরক্ষাকবচের ব্যবস্থা রয়েছে ভারতীয় সংবিধানে।

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। মৌলিক অধিকারগুলির অঙ্গ হিসেবে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। যে কোনও ধর্মাবলম্বী ভারতবাসীর নিজের ধর্মীয় মতামত ব্যক্ত করা, ধর্ম পালন ও ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা রয়েছে। সংখ্যালঘুদের বিষয়ে ভারতের অবস্থান সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয় সেই ১৯৩০-এই। স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃবৃন্দ এই মর্মে অবস্থান নিয়েছিলেন যে : "যতক্ষণ একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে পদদলিত করার চেষ্টা চলে বা তাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের তালে তাল মিলিয়ে চলার জন্য বাধ্য করা হয়, ততক্ষণ একটি দেশে স্থিতাবস্থা থাকতে

পারে না...ভারতে আমরা সবার কাছে এই বিষয়টি পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, আমাদের নীতিই হবে সংখ্যালঘুদের এই স্বাধীনতা দেওয়া এবং কোনও অবস্থাতেই তাদের ওপর বলপ্রয়োগ বা দমননীতি সহ্য করা হবে না।" ভারত ধর্মনিরপেক্ষ, কারণ এ দেশের মানুষ, সংস্কৃতি, জাতীয় ভাবধারাও ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মনিরপেক্ষতাই ভারতের ভবিতব্য।

ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। কিন্তু ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানে এ দেশে যত ছুটিছাটা রয়েছে, অন্য কোনও ধর্মনিরপেক্ষ দেশে তা নেই। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা কখনও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে বাধা দেয়নি। কারণ ভারতের সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা নিয়ে গত কয়েক বছরে কিছু বিতর্ক দেখা দিয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থকদের মতে, রাষ্ট্র হিসেবে ভারত যথেষ্ট ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি। অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষতার সমালোচকরা অভিযোগ করেন যে, রাষ্ট্র আসলে ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে সংখ্যালঘুদের তোষণ করছে। ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতীয় গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের সীমাবদ্ধতা বা ব্যাবহারিক দিক নিয়ে আজ যে বিতর্ক চলছে তাতে এই আদর্শের গুরুত্ব কিছু কমে যায় না।

বিশ্বায়নের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিছু আশঙ্কা জেগেছে। প্রকৃত এবং সম্ভাব্য দুই রকম আশঙ্কাই। বিশ্বায়নের প্রবল দাপট বিভিন্ন সংস্কৃতি-বৈচিত্র্য ভেঙেচুরে তাকে একটা সমসত্ত্ব রূপ দেওয়ার চেষ্টা করবে না তো? কিংবা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীগুলির স্বতন্ত্র পরিচয়, নিজস্বতাকে কোণঠাসা করা হবে না তো? অথবা এই বিশ্বায়নের চাপ ভূমিপুত্রদের ভাষাগত, ঐতিহাসিক এবং আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য কেড়ে নিয়ে এক সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের সূচনা করবে কি? আশঙ্কা অনেক! কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশেও নিজস্বতা বজায় রাখতে পেরেছে। বহির্জগতের সাংস্কৃতিক প্রভাবে এ দেশের সংস্কৃতি ক্রমেই সমৃদ্ধ হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে এ দেশের সংস্কৃতির পুনরুত্থান, পুনর্নবীকরণ এবং পুনরুজ্জীবন ঘটছে।

দীর্ঘকাল ধরে বৈচিত্র্যের সঙ্গে সহাবস্থানের অভিজ্ঞতা ভারত সারা বিশ্বকে জোর গলায় শোনাতে পারে। ভারতের বৈচিত্র্যের ওপর বিভিন্ন সময় আঘাত এসেছে। বিশ্বের দরবারে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের' অনন্য আদর্শ হিসেবে ভারত তার নিজের স্থান করে নিলেও আর্থিক বৈষম্য, ধর্মীয় মৌলবাদ ও জাতিসংঘর্ষ এই ঐক্যের ভিত্তি বিনষ্ট করে দিতে চাইছে। সংস্কৃতি, ধর্ম ও জাতিসত্তার নামে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হিংসার সাক্ষী থেকেছেন এ দেশের মানুষ।

আধুনিক সমাজগুলি ক্রমেই বহুসংস্কৃতিসম্পন্ন হয়ে উঠছে। সমস্ত সমাজেই প্রভাবশালী গোষ্ঠীর আচরণ নিয়ে বেশি মাথা ঘামানো হয়। ধর্মনিরপেক্ষতা কখনওই সংখ্যালঘুর সাম্প্রদায়িকতাকে বৈধতা দেয় না। অধ্যাপক শিব বিশ্বনাথনের ভাষায় ধর্মনিরপেক্ষতা 'সংখ্যালঘুর তরফে আইন লঙ্ঘনকে সংখ্যাগরিষ্ঠের তুলনায় ভালো বলে মনে করে না'।

ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্যও সমানভাবে বিস্ময়কর। ভাষাই একটি গোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্যের চরম প্রতীক। বহুভাষাবাদ ভারতীয় জনজীবনের এক বৈশিষ্ট্য। এ দেশের বহু লেখকই যে ভাষায় লেখেন, সে ভাষায় হয়তো তারা কথা বলেন না। মহাদেশ-সম এই দেশে প্রায়শই একই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে আলাদা আলাদা ভাষা বা উপভাষা ব্যবহার করে থাকেন। এটাই এখানকার বৈশিষ্ট্য। যেমন উত্তর-পূর্ব ভারতের একজন খাসি মহিলা তার মতো অন্যান্য মহিলার সঙ্গে মহিলাদের উপভাষাতেই কথা বলেন। কিন্তু খাসি পুরুষদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি পুরুষদের উপভাষাই ব্যবহার করে থাকেন। দেশের বিভিন্ন অংশে ভাষার আন্দোলন দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতাকে বিপন্ন করেছে। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রধান সমস্ত ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিয়ে এবং ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন করে অসামান্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, সকলকে আপন করে নেওয়া বা সকলকে শামিল করে এগিয়ে চলার নীতি নিয়ে ভারতের যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে, সময় ও ইতিহাসের পরীক্ষায় তা উত্তীর্ণ হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক কাঠামোতে আইনের অনুশাসন ও মৌলিক মানবাধিকারগুলির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পরীক্ষানিরীক্ষায় সাফল্যই বিশ্বের দরবারে ভারতকে বিশেষ স্থান দিয়েছে।

বহুসংস্কৃতির পারস্পরিক সহাবস্থানের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত বোধহয় ভারত। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সভ্যতার সংঘাত ঘটায়—২০০৪ সালের ইউ এন ডি পি-র প্রতিবেদনে এমন ধারণা নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বৈচিত্র্য এবং সংখ্যালঘুর অধিকার রক্ষার মধ্যেই উন্নয়নের মন্ত্র রয়েছে। সেইসঙ্গে কীভাবে 'দরিদ্র ও বৈচিত্র্যময় দেশগুলি বহুসংস্কৃতির নীতিসমূহ নিয়ে' উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে ভারত তার একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত বলেও এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতের অভিজ্ঞতা বলে কোনও সংস্কৃতিই সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। কোনও সংস্কৃতিই শ্রেষ্ঠ জীবনাচরণের পথ দেখায় না। বিভিন্ন সংস্কৃতির ভাব বিনিময়, আদান-প্রদানের মাধ্যমে শেষপর্যন্ত বিভিন্ন দেশ ও সমাজই উপকৃত হয়।❑

[লেখক নয়াদিল্লির ইন্সটিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেস-এর অধিকর্তা।
email: ashnarainroy@gmail.com]

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিবর্তন ও ঈশানকোণের প্রসঙ্গ

ভারতীয় গণতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বজায় করা নিয়ে নানা মতপার্থক্য ও বিতর্ক উঠেছে অতীতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সময়ে সময়ে এর জন্য বহু কমিশন গঠন করা হয়েছে, পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। এ কথা বললে ভুল হবে না যে কেন্দ্র-রাজ্য বা আন্তঃরাজ্য সমস্যা মূলত আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক সমস্যা। অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূর না হলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সুদূরপরাহত থেকে যাবে। অতএব যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অবশ্যম্ভাবী।
লিখছেন **ড. প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।**

পূর্বোত্তর ভারতের কয়েকটি রাজ্যে তাঁর সাম্প্রতিক সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঈশানকোণের সার্বিক উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছেন। দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প—একটি অসমের দুধনই থেকে মেঘালয়ের পশ্চিম গারো পার্বত্য জেলার মেণ্ডিপাথার পর্যন্ত প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দীর্ঘ রেললাইন ও অপরটি ত্রিপুরার পলাটানায় তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন (ONGC) ও ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমের যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মিত বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প— উদ্‌বোধন করলেন। নয় হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগে প্রতিষ্ঠিত এই প্রকল্পটি পূর্বোত্তর ভারতের বৃহত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। 'পূবে তাকাও' নীতির উত্তরণ হয়েছে 'পূবে কাজ করো' নীতিতে। প্রকল্পগুলির ভূমিকা ও প্রভাব যে এতে সুদূরপ্রসারী হবে তা বলাই বাহুল্য। প্রান্ত অঞ্চলের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অংশের মানসিক, আত্মিক ও প্রগতির যে যোগসাধন, তা সম্ভব হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সকলকে নিয়ে বহুমাত্রিক ও বহুসংস্কৃতিবিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে মিলনের নানামুখী প্রয়াসকে স্বীকার করেই।

'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান'-এর এই যে সাতনলি হার, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বৈচিত্র্য নিয়ে যে সার্বিক উন্নয়নের কর্মধারা, তার মূলে রয়েছে ভারতীয় সংবিধানের সুদৃঢ় ভিত্তি। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি সংবিধান লাগু হল। বহু রাজনীতিবিদ, আইন ও সংবিধানবিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট পণ্ডিতদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, বিশ্লেষণ ও আলোচনার ফলশ্রুতিতে এর উদ্ভব। এর মূল স্তম্ভ দুটি—সার্বিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো।

ভারতকে সংবিধানে বলা হয়েছে—'Union of States'। কেন্দ্রে সরকার, উনত্রিশটি রাজ্য সরকার ও কয়েকটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে এর শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার থেকে এটি পৃথক। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার শাসনতন্ত্রের থেকেও অনেক অমিল রয়েছে। ভারতে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি—কখনও কখনও তা একে অপরের বিরুদ্ধ—সব নিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সঠিকভাবে ধরে রাখার জন্য সংবিধানপ্রণেতারা অনেক চিন্তাভাবনা করেছেন। সুপ্রাচীন ইতিহাস ও নানা সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ও অমিত বৈচিত্র্য থেকে দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তির বিষয়ে পণ্ডিতেরা একান্ত সংবেদনশীল। একটি কেন্দ্রাভিমুখী ও অপরটি কেন্দ্রাতিগ। এই দুই বিপরীতমুখী প্রবণতা ও শক্তির মধ্যে সমন্বয়সাধন একান্ত জরুরি, যাতে দেশের অখণ্ডতা, নিরাপত্তা ও সার্বভৌম অস্তিত্ব বজায় থাকে। তাই এই শাসনব্যবস্থায় অনেকগুলি এককেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য রাখা হয়েছে। ভারতকে বলা হয়েছে 'a federal state with unitary features' (এককেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন যুক্তরাষ্ট্র)।

সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ডে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক ক্ষমতা নির্দিষ্ট করা আছে। সপ্তম তফসিলে এ ব্যাপারে এক তালিকা অন্তর্ভুক্ত করা আছে। তিনটি সূচি রয়েছে। প্রথমটিতে যে বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে, সেগুলি দেওয়া আছে। দ্বিতীয় সূচিতে রাজ্য সরকারগুলি যে যে বিষয়ে আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, তা বর্ণিত আছে। তৃতীয় সূচিটিকে যৌথ সূচি বা Concurrent List বলা হয়, যাতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি যৌথভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। মনে রাখতে হবে যে, কেন্দ্রীয় আইনের সঙ্গে কোনও রাজ্য বিধানসভা প্রণীত আইন বিরুদ্ধ হলে, কেন্দ্রীয় আইনই বলবৎ থাকবে। আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আর্থিক ক্ষমতা ও কর-রাজস্ব বিভাজন সম্পর্কীয়। অর্থ কমিশন এ ব্যাপারে যথাযথ সূত্র প্রণয়ন করে। সেই অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বণ্টনের সুপারিশ করে।

সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন যে ধারাবাহিকভাবে হয়ে আসছে, তাতে প্রথমদিকে একটি দলের প্রাধান্য থাকলেও পরে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নানা দল ক্ষমতায় আসে। অনেক আঞ্চলিক দলের উদ্ভব হয় এবং এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, কেন্দ্রে ও রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন দল বা কোয়ালিশন (জোট) বা সম্মিলিত ফন্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে ক্ষমতায় আসে। এর ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নানা ধরনের দ্বন্দ্ব ও অনেক সময় সরব বিরোধের উৎপত্তি হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে টানাপোড়েন, মনোমালিন্য, মতবিরোধ ও তার ফলশ্রুতিতে সামগ্রিক ব্যবস্থার উপর চাপ পড়ে, যা প্রায়শই অশুভ ও অহিতকর প্রবণতার জন্ম দেয়। সাম্প্রতিক অতীতে বিভিন্ন দলের সহযোগিতায় গড়া জোট সরকারগুলির কার্যধারায় অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, আর চেপে বসেছে রাজনৈতিক বিতর্ক ও অস্থিরতার আবহ।

স্পষ্টত, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর একক প্রাধান্য বা 'মনোলিথ' ভাঙল। প্রথমে কেরালা ও তারপর ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেস-বিরোধী দল অনেক রাজ্যে ক্ষমতায় আসে। তারা কংগ্রেস-বিরোধী কর্মসূচি নিয়ে রাজনৈতিক ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই এক দল, এক কর্মসূচি, এক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অবসান হয়ে গেল। ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে থেকেই রাজ্যগুলি নানা দাবিদাওয়া, অধিক আর্থিক ক্ষমতা, কর-রাজস্বের ক্ষেত্রে রাজ্যের অধিকতর অংশীদারিত্বের কথা বলা শুরু

করে। এর ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একটা অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি সূচিত হল।

ভারতীয় সংবিধান-প্রণেতারা মোটামুটিভাবে তিনটি স্তম্ভের উপর যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে দাঁড় করিয়েছিলেন। অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় সরকার, নমনীয়তা ও রাজ্যগুলির সঙ্গে সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের অভিজ্ঞতা ও ভারতের পূর্ববর্তী রাজত্বগুলির উত্থান-পতনের ইতিহাস—এসবই তাঁদের মাথায় ছিল। ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পুরোনো রীতিনীতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে একটি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা প্রণয়ন করে সংবিধান সভায় পাস করানো হয়েছিল। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছাড়াও দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এবং আর্থ-সামাজিক স্তরে ভিন্ন ভিন্ন মানে থাকা প্রান্তিক ও অনুন্নত শ্রেণির জনগণের আর্থিক মুক্তি ও উন্নয়নের কথা সচেতনভাবে মনে রাখা হয়েছিল।

বেশ কয়েকটি এককেন্দ্রিকতার বৈশিষ্ট্য যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল—একক নাগরিকত্ব। অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় সরকার, যা সংবিধানের বিশেষ বিশেষ অনুচ্ছেদ প্রদত্ত বিধান অনুসারে রাজ্যগুলির উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। কেন্দ্রীয়সূচি ও রাজ্যসূচির অতিরিক্ত বিষয়গুলিতে কেন্দ্রের ক্ষমতাই চূড়ান্ত। একক সংবিধান কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রাজ্যগুলির সীমা ও নাম পরিবর্তনের ব্যাপারে কেন্দ্রের অনুমতি ও ক্ষমতা প্রয়োগ বাধ্যতামূলক। বিচারব্যবস্থাও একক। দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিমকোর্টের অধীনে হাইকোর্ট সহ বিচারব্যবস্থা পরিচালিত। জরুরি অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব বাড়ে। রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে রাজ্যপাল নিয়োগ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাষ্ট্রপতির অধীন। সর্বভারতীয় প্রশাসনিক সেবার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অধিক। কর-রাজস্ব থেকে উদ্ভূত আয়ের বণ্টন ও উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদনের ব্যাপারে অনেক সময় নির্দিষ্ট বিধান অনুসারে রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের উপর নির্ভর করতে হয়। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও কোনও কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ে রাজ্যগুলির আইনসভাগুলি স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়ন করতে পারে না। তা অর্থাৎ খসড়া বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল।

ভারতীয় সংবিধানের এই যে সব বৈশিষ্ট্য সংবিধান-প্রণেতারা অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তার প্রেক্ষাপটটিও লক্ষণীয়। স্বাধীনতার সময় ব্রিটিশ ভারত, যা মূলত এককেন্দ্রিক বা Unitary ও প্রায় ৫৮০টি দেশীয় রাজ্য নিয়ে দেশটির বিস্তার। এর ফলে সংবিধানকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে নমনীয় ও কোনও কোনও ক্ষেত্রে সুদৃঢ় রাখা হয়েছে, দেশের অখণ্ডতা ও সুশাসন কায়েম করার লক্ষ্য মাথায় রেখেই। কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি নিহিত রয়েছে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ও আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। যদি সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হয়, তাও করা যায় বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে। সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংসদের দুই সভাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের সমর্থনে ও সংসদে উপস্থিত ভোটদাতা সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে পাস করা যায়। রাজনৈতিক ও আইনসভায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ক্ষমতাসীন দল এইভাবে বা কখনও যৌথ অধিবেশন ডেকে সংবিধান সংশোধন করে জনসাধারণের উন্নয়নে আইন প্রণয়নের পথ সুগম করে।

ভারতের বাস্তব পরিস্থিতি ও অতীত ইতিহাসের বিচারে এইসব বিশেষ ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। অতীতে দেখা গেছে, শক্তিশালী কেন্দ্র না থাকলে বা কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের দুর্বলতার সুযোগে অনেক বিভেদকামী বা ক্ষুদ্র ও গোষ্ঠীস্বার্থ সমন্বিত শক্তির উদয় হয়। নানা ধরনের উগ্রবাদী ও সন্ত্রাসবাদী শক্তি দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টায় রত থেকে শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সংবিধান-প্রণেতারা এইসব বিষয় বিবেচনা করেই দেশের শান্তিপূর্ণ অগ্রগতির পথ সুগম করতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ব্যাপকতর করেছেন। সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা Co-operative Federalism-এর ধাঁচে ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা আবর্তিত হয়ে চলেছে ছ-দশকের বেশি সময় ধরে।

এই আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার বিভাজন, আর্থিক ও কর-রাজস্বের ব্যবস্থা, প্রশাসনিক ক্ষমতা, পরিকল্পনা প্রণয়ন, আন্তঃরাজ্য সম্পর্ক, সারা দেশে পণ্য পরিবহণ সংক্রান্ত আইন প্রভৃতি বিষয়ে শক্তিশালী কেন্দ্রকে নিয়েই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিশেষ রূপ। এই চলার পথ সব সময় মসৃণ হয়নি। মাঝে মাঝেই নানা বিতর্ক, কেন্দ্রীয় সরকার ও কোনও কোনও রাজ্য সরকারের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে অনেক প্রশ্নের জন্মও দিয়েছে। বস্তুত, বিগত ছয় দশকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। সেদিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। ভারত নিঃসন্দেহে আজ শিল্প, প্রতিরক্ষা ও আর্থিক ক্ষেত্রে একটি বড় শক্তি হিসেবে এশিয়া তথা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক শ্রেণি, জাতি, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীভিত্তিক দল ও 'এলিট'-এর উদ্ভব হয়েছে, যারা সক্রিয়ভাবে নিজেদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে সরব হয়েছে। বিপরীতমুখী নানা পরস্পরবিরোধী শক্তির টানাটানিতে ধনী, মধ্যবিত্ত ও নির্ধনের ভিন্ন ভিন্ন দাবি ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আবহে সামজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য গোটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলেছে। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি ও উদীয়মান শিল্প-ভিত্তিক ও বিজ্ঞান-মনস্ক চিন্তাধারার মধ্যে তীব্র বিরোধাভাস ও দ্বান্দ্বিক অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি ও শ্রেণির জন্ম দিয়েছে। আঞ্চলিকতাবাদ, জাতি-সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র পরিচিতি-ভিত্তিক রাজনীতি, আর্থসামাজিক মানদণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে থাকা মানুষ ও গোষ্ঠীর এই যে আবর্তন, তা একটি স্বতন্ত্র মাত্রায় সমাজ ও রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এর ফলে সরকার গঠনে বিভিন্ন বিরুদ্ধ শক্তি কখনও কখনও ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে এক ছাতার তলায় এসেছে। জোটবদ্ধ সরকার গড়েছে। নানা চাপ-বিতর্ক নিয়ে কখনও এই ধরনের সরকার সফল হয়েছে। কখনও আবার নানা টানাপোড়েনে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেঙে পড়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে নানা ইস্যুতে বির্তকের জেরে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো নিয়ে কখনও জোর বিতর্ক, কখনও হতাশা ও সংবিধানের বিভিন্ন ধারা-উপধারা নিয়ে মতান্তর ও মনান্তর হয়েছে রাজনৈতিক দল, নীতিপ্রণেতা ও সংবিধান-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে। রাজনীতির রণাঙ্গনে নতুন নতুন দল বিভিন্ন

মতাদর্শ নিয়ে আবির্ভূত হতে থাকল। এর গতি তীব্রতর হল ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একাধিপত্যের পরিবর্তে এই যে নতুন সমীকরণ, সেটা ভারতের রাজনীতির মানচিত্রকে আমূল বদলে দিয়েছে। বর্তমানে উনত্রিশটি রাজ্যের মধ্যে বেশ কয়েকটিতে আঞ্চলিক দলগুলি ক্ষমতায়। বাকিগুলিতে দুটি জাতীয় দল—জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতীয় জনতা পার্টি, কোথাও একটি, কোথাও বা তাদের সহযোগী দল বা দলসমূহকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষমতায় আসীন। বহুকেন্দ্রিক ও বহুমুখী বৈচিত্র্য এবং জোট রাজনীতি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, যা দেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে প্রায় অকল্পনীয় ছিল।

সে যাই হোক, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পুনর্বিবেচনা নিয়ে নানা সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে চাপ এসেছে এবং ধারাবাহিকভাবে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেগুলি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা যাক। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তামিলনাড়ুর তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী এম করুণানিধির উৎসাহে ড. পি ভি রাজামান্নারের নেতৃত্বে একটি তিন সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। ভারতীয় সংবিধানের বেশ কয়েকটি ধারা পুনর্বিবেচনা করতে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন সম্পর্কে সুপারিশ করতে বলা হয়। এই কমিটির পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টে ২৪৯, ৩৫৬ ও ৩৫৭ ধারার অবলুপ্তির সুপারিশ করা হয়। কমিটি আরও বলে যে, বেশ কয়েকটি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের সূচি থেকে রাজ্যের সূচিতে হস্তান্তর করা হোক। এর মধ্যে বিশেষত উৎপাদন শুল্ক সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সূচির ৮৪ নং ও ৫২ নং বিষয় রাজ্যগুলির হাতে দিয়ে দেবার কথা বলা হয়।

এরপর ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে পালাবদলের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে একটি মেমোরান্ডাম বা স্মারকপত্র প্রকাশ করে, যা এক অর্থে রাজামান্নার কমিটির পদাঙ্ক অনুসরণ করার শামিল। শক্তিশালী রাজ্য সরকারের পক্ষে সওয়াল করে বলা হয় যে, যদি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কর্তৃত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়, তবে তা কেন্দ্রকে দুর্বল করবে না বা বিভেদকামী শক্তিকেও উৎসাহ দেবে না। শিক্ষাকে রাজ্যসূচি থেকে যৌথসূচিতে এনে সংবিধানে যখন রদবদল করা হয়েছে, তখন রাজ্য সরকারগুলি ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের ফলে শক্তিশালী হলে কেন্দ্র দুর্বল হয়ে পড়বে না, যা দেশের স্বার্থের পরিপন্থী হবে।

পরবর্তীকালে আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল বিচারপতি আর এস সরকারিয়ার নেতৃত্বে কমিশন গঠন। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে এই কমিশন কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের উপর দীর্ঘ রিপোর্ট পেশ করে, যাতে ২৫৬টি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ নথিবদ্ধ করা হয়েছে। ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (NDA) সরকারের আমলে ২০০২ খ্রিস্টাব্দে আর-একটি কমিশন গঠন করা হয়, যার নাম 'সংবিধানের কার্যোপযোগিতা পর্যালোচনার্থে গঠিত জাতীয় কমিশন' (NCRWC)। এই কমিশনের রিপোর্টে অর্থ, বাণিজ্য, রাজস্ব, কেন্দ্র-রাজ্য বিবাদ-বিসংবাদ মেটাবার বিষয় ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কমিশনের মূল বক্তব্য যে, শক্তিশালী কেন্দ্র ও শক্তিশালী রাজ্যের মধ্যে কোনও বিরুদ্ধ সম্পর্ক নেই। সুস্থ শরীরের জন্য শক্তিশালী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দরকার। ক্ষমতার অতি-কেন্দ্রীয়করণ ও অপব্যবহারই মূল সমস্যা। নচেৎ কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক অনেকটা সমগ্র দেহের সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন, সেইরকমই।

আবার ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইউ পি এ-১ পরিচালিত সরকার বিচারপতি এম এম পুঞ্ছির নেতৃত্বে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক পর্যালোচনার জন্য কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক সংক্রান্ত এক কমিশন গঠন করে। তিন বছর পর ২০১০ খ্রিস্টাব্দে এই কমিশন তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দেয়। আইন প্রণয়ন, শাসনক্ষমতা ও আর্থিক বিষয়, মূলত কর-রাজস্বের বণ্টন ব্যবস্থা ঠিক ঠিকভাবে কাজ করছে কি না; ভারতীয় সমাজ ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ও বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সংবিধান উল্লেখিত ব্যবস্থাগুলি ঠিক ভূমিকা পালন করছে কি না—এইসব বিষয়ের উপর যথার্থ আলোকপাত করা এই কমিশনের দায়িত্ব ছিল। কমিশন বিষয়গুলি ন-টি ভাগে ভাগ করে ন-টি টাস্ক ফোর্স গঠন করে, যাতে পর্যালোচনা ব্যাপক, বিস্তারিত ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। ন-টি বিষয় হল—

(১) কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংবিধানের নির্দেশাবলি।
(২) অর্থনৈতিক ও আর্থিক সম্পর্ক।
(৩) একীকৃত ও সংহত অভ্যন্তরীণ বাজার ও পণ্য-করের ক্ষেত্রে সমন্বয়সাধন।
(৪) স্থানীয় সরকার ও বিকেন্দ্রীকৃত শাসন।
(৫) অপরাধ দমন, জাতীয় নিরাপত্তা ও কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহযোগিতা।
(৬) প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশ, জমি ও কৃষি।
(৭) পরিকাঠামো উন্নয়ন ও বৃহৎ প্রকল্প।
(৮) সামাজিক-রাজনৈতিক প্রগতি, সার্বজনীন নীতি ও সুশাসন।
(৯) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক প্রগতি।

কমিশন বিভিন্ন রাজ্য সরকারের দ্বারা উত্থাপিত বিষয়, দাবিদাওয়া ও কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্‌বেগ, আশঙ্কা, দেশের অখণ্ডতা রক্ষা, উগ্রপন্থীদের ধ্বংসাত্মক নীতি ও কার্যকলাপ—এ সমস্ত নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত আলোচনা করেছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সম্প্রতি বেশ কয়েকটি বিষয়কে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছে বিভিন্ন মহল থেকে। সংবাদমাধ্যমে, সংসদে, বিতর্ক সভায় সরব আলোচনা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার যখন সিদ্ধান্ত নেয় যে জাতীয় সন্ত্রাস দমন কেন্দ্র বা NCTC গঠন করা হবে, তখন বেশ কয়েকটি রাজ্য, যথা—বিহার, গুজরাত, হিমাচলপ্রদেশ, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, পঞ্জাব, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গ—'আইন-শৃঙ্খলা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত একটি বিষয়', তাই কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ অনভিপ্রেত— এই অজুহাতে এর বিরোধিতা করে। পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) সংক্রান্ত প্রস্তাব নিয়েও কয়েকটি রাজ্য প্রতিবাদে মুখর হয়। অন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙে নতুন রাজ্য তেলেঙ্গানা প্রতিষ্ঠার সময়ও জোরদার বিতর্ক ও প্রতিবাদ শুরু হয়। মূলত, রাজ্য আইনসভার সম্মতি ব্যতিরেকে রাজ্য প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রের ক্ষমতা প্রয়োগ— আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। সংবিধানের ৩ ও ৪ নম্বর অনুচ্ছেদ, যেখানে নতুন রাজ্য গঠন, রাজ্যের কোনও এলাকা ও সীমান্তের পুনর্বিন্যাস, রাজ্যগুলির নাম পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে সংসদকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে ড. বি আর

আম্বেদকর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, অনুচ্ছেদ তিন ও চার দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা সংবিধানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়। এগুলি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতেই ব্যবহার করা হয় এবং এতদ্দ্বারা কেন্দ্র রাজ্যের ক্ষমতাকে খর্ব করতে পারে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, পূর্বে ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় ও উত্তরাখণ্ড রাজ্য গঠনের সময় সংশ্লিষ্ট রাজ্য আইনসভার সম্মতি নেওয়া হয়েছিল। NCTC-এর ক্ষেত্রেও কেন্দ্রের যুক্তি যে, এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূল সুরের বিরোধী নয়। বস্তুত, অনুচ্ছেদ ৩৫৫-তে এই ক্ষমতা নিহিত। যেখানে বলা আছে, "It shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every state is carried out in accordance with the provisions of this Constitution" অর্থাৎ বিদেশি আগ্রাসন ও অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা থেকে রাজ্যকে রক্ষা করা কেন্দ্রের দায়িত্ব। NCTC-এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বরে মুম্বই-এ পাকিস্তান থেকে আগত জঙ্গিরা যখন নরহত্যা চালিয়েছিল, তারপর। বিদেশী আক্রমণকারীদের হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর তাগিদেই এই ব্যবস্থা।

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এই যে বিবর্তন ধারাবাহিকভাবে হয়ে চলেছে, তা শুধুমাত্র সম্ভব হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুদয় ও তাদের কর্মধারার জন্য, এমন নয়। বিচারব্যবস্থা, বিশেষ করে শীর্ষ আদালত বা সুপ্রিমকোর্টের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রায়ের ফলেও যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা প্রভাবিত হচ্ছে। এ সম্বন্ধে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ মামলার রায়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রাজস্থান রাজ্য বনাম ভারত সরকার (১৯৭৭) মামলায় 'co-operative federalism' বা সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি বেগ এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে সংবিধানকে 'amphibian' বা উভচর বলেছেন। 'It can move either on the federal, or on the unitary plane, according to the needs of the situation and circumstances of a case.' অর্থাৎ পরিস্থিতির প্রয়োজনে কখনও যুক্তরাষ্ট্রীয়, আবার সময় সময় এককেন্দ্রিকতার স্তরে কাজ করার ক্ষমতাও এ সংবিধানের রয়েছে। এস আর বোম্মাই বনাম ভারত সরকার (১৯৯৪) মামলার রায় যুগান্তকারী। এতে ৩৫৬ ধারার যথেচ্ছ ব্যবহার সীমিত করে দেওয়া হয়। কেউ কেউ বলেন যে, ওই রায় ৩৫৬ ধারাটিকে প্রায় 'dead letter'-এ পর্যবসিত করে দিয়েছে।

বিচারপতি আহমদি 'সংবিধান' সম্পর্কে 'pragmatic federalism' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর রায়ে বলা আছে—"It would thus seem that the Indian Constitution has in it not only features of a pragmatic federalism which, while distributing legislative power and indicating the spheres of governmental powers of State and Central governments, is overlaid by strong unitary features." অর্থাৎ এই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই একটি এককেন্দ্রিকতার সুর স্পষ্ট।

হরিয়ানা বনাম পঞ্জাব মামলায় বিচারপতিরা সংবিধান প্রসঙ্গে 'semi-federal' (আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়) শব্দ ব্যবহার করেছেন। অপর একটি মামলা— শামসের সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য—তার রায়ে সংবিধানকে বলা হয়েছে 'more unitary than federal' অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত এককেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, সংবিধান প্রণয়ন সভা বা Constituent Assembly-তে পণ্ডিত নেহরু ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর তাঁর ভাষণে স্পষ্ট করেছিলেন যে, কেন্দ্রে সরকারের প্রশাসন যন্ত্র ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে সুসংহত ও একমুখীন দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। রাজ্যগুলির সঙ্গে সহযোগিতা ও পরামর্শের মাধ্যমে এটি সম্ভব। 'All power and authority of the Sovereign Independent India, its constitutent parts and organs of government are derived from the people', অর্থাৎ স্বাধীন সার্বভৌম ভারতের এবং রাজ্যগুলির সরকার ও সরকারের সমস্ত অঙ্গের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের উৎস জনগণ। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, ভাষার ক্ষেত্রে উগ্রবাদ যখন বেশি মাত্রায় সক্রিয় থাকে, তখন এককেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁক রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষে নিঃসন্দেহে আশীর্বাদস্বরূপ।

পণ্ডিত নেহরুর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় উদ্দেশ্য ছিল, তাঁরই ভাষায়, 'to develop the habit of co-operative working' বা শাসনব্যবস্থায় সহযোগিতার আবহে কাজ করার মানসিকতা তৈরি করা। তাঁর সময়ে যোজনা কমিশন, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রান্ট, যা যোজনা কমিশন দ্বারা অনুমোদিত, তা প্রায় শতকরা সত্তর ভাগ, আর বাকি ত্রিশ ভাগ দেওয়া হয় অর্থ কমিশনের মাধ্যমে। অর্থ কমিশন ধারা ২৮০-এর মাধ্যমে রাজস্ব বণ্টন করে। বর্তমানে যোজনা কমিশন নীতি-আয়োগে রূপান্তরিত হয়েছে।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানা রাজনৈতিক শক্তির বিবর্তন প্রভাব ফেলেছে, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। এবার উল্লেখ করতেই হয় এক যুগান্তকারী বিষয় ও নীতির পরিবর্তনের কাহিনি। ১৯৯০-এর দশকে গ্রহণ করা হয় আর্থিক উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের নীতি। বিভিন্ন রাজ্য সরকার এর সুযোগ নিতে চেয়ে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের আগ্রহ নিয়ে দেশের সীমা পেরিয়ে নানা আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গেও বহুমাত্রিক চুক্তি সম্পাদন করছে। বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে এইসব প্রচেষ্টা নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

এর আগে জাতীয় ফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ (NDC)-র পুনরুজ্জীবন হয়। সেই সময়ের সরকারের মতে, এর ফলে অতি-কেন্দ্রীকরণ নীতির পরিবর্তে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় ভঙ্গিতে চলার নীতি নেওয়া হল। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে NDC-র দুটি সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুমোদনের পূর্বে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সামনে এই সম্মেলনে যোজনা কমিশন দ্বারা পরিকল্পনার খুঁটিনাটি নিয়ে বিশদ বিবরণ পেশ করা হয়। উদ্দেশ্য, কেন্দ্র-রাজ্য অংশীদারিত্ব সুনিশ্চিত করা।

এইসঙ্গে আর-একটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল—আন্তঃরাজ্য কাউন্সিল-এর প্রতিষ্ঠা। এটাও হল কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে নতুন আলোচনার ফোরাম তৈরি করার জন্য। ১৯৯০-এর আগস্ট মাসে এর প্রথম বৈঠক বসে। ওই বৈঠকে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক,

এমনকি সরকারিয়া কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশ নিয়েও আলোচনা করা হয়।

এরপর রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হল। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনের পর নরসিমহা রাও-এর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। তিনি জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ ও আন্তঃরাজ্য পরিষদ—এই দুই সংস্থাকে সাম্প্রদায়িকতা, সুষম উন্নয়ন প্রভৃতির মতো বিভিন্ন জটিল সমস্যার ব্যাপারে আলোচনার ফোরাম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে মত বিনিময়ের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তিয়াত্তর এবং চুয়াত্তর নম্বর সংবিধান সংশোধনী বিল সংসদে পাস করা হয়। এর মাধ্যমে দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বিকেন্দ্রীকৃত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পথ সুগম হয়েছে। ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণের ক্ষমতায়নের পথে এটি একটি নিশ্চিত পদক্ষেপ। পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক সহ বিভিন্ন রাজ্যে এটির সফল রূপায়ণ হতে থাকে।

আগেই এস আর বোম্মাই বনাম ভারত সরকার মামলায় নয় বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চের রায়ের কথা বলা হয়েছে। এটি কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী রায়। মূল কথাটি ধারা ৩৫৬-কে নিয়ে, যাতে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার সংস্থান রয়েছে। রায়ে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি কোনও ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি বা মত নয়। যে তথ্য বা ঘটনা তাঁর সামনে রাজ্য সম্পর্কে পেশ করা হচ্ছে, তা থেকে যেন একটি ন্যায়সংগত অনুমানে বা সিদ্ধান্তে আসা যায় এবং তা বিচারযোগ্য হওয়া চাই। তথ্যনির্ভর বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হতে হবে এবং এতে যেন ক্ষমতার অপপ্রয়োগ না হয়। যখন সংবিধানসম্মত ভাবে শাসনব্যবস্থা চলছে না বা সংবিধান ভেঙে পড়েছে তখনই ৩৫৬ ধারার প্রয়োগ করা যেতে পারে কেবলমাত্র সাংবিধানিক ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য। তার অতিরিক্ত কোনও উদ্দেশ্যে নয়। মন্ত্রীসভার দেওয়া পরামর্শের ভিত্তি ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ৭৪(২) ধারায় দেওয়া আছে। এই রায় কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এক আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। এ প্রসঙ্গে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও আঞ্চলিক নেতাদের মধ্যে বৈঠকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁরা একযোগে 'Federation Without a Centre'-এর ডাক দিয়েছিলেন। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকার গঠনের পরে তাঁরা সকলে ভেবেছিলেন যে, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার যেন প্রায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। ১৯৯৮-এ এন ডি এ সরকার কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে নতুন আবহ তৈরি করে। ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় ও উত্তরাঞ্চল (উত্তরাখণ্ড) রাজ্য গঠিত হল। আঞ্চলিক, জাতিগত ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ সেই ধাঁচা।

একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চমকপ্রদ অগ্রগতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিকাঠামো ও বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের প্রসার, সর্বোপরি ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু হওয়া প্রভৃতি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। ভারতের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে মানুষ একদিকে বিজ্ঞানকে আত্তীকরণ করেছে, আবার অন্যদিকে নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। এই যে দ্বিমুখী গতিপ্রকৃতি, তা রাষ্ট্রীয় জীবনে নানা টানাপোড়েনের জন্ম দিচ্ছে। অপেক্ষাকৃত নমনীয় সংবিধানের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এই সমস্যা সমাধানের সুযোগ নিহিত রয়েছে।

এ প্রবন্ধ শুরু হয়েছিল ভারতের ঈশানকোণের রাজ্যগুলির প্রসঙ্গ নিয়ে। অন্যান্য উপজাতি ও ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এই অঞ্চলে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, পরিচিতিবোধ থেকে উদ্ভূত নানা আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, রাজনৈতিক ও স্বতন্ত্র জাতিসত্তা সম্পর্কিত দাবিদাওয়াকে সংবিধানের কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করে সমাধান করার দৃষ্টান্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাফল্যই সূচিত করে। সমগ্র পূর্বোত্তর অঞ্চল কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের মর্যাদা পায়। নাগাল্যান্ড অবশ্য আগেই স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পর্ষদ আইন ১৯৭১-এর বলে পূর্বোত্তর পরিষদ শিলং-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে সিকিম রাজ্যও এর সঙ্গে যুক্ত হয়। এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, তার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও রূপায়ণের মাধ্যম হিসেবে এই সংস্থা কাজ করে আসছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে এই পূর্বোত্তর রাজ্যগুলি—অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, অরুণাচলপ্রদেশ, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মণিপুর এবং সিকিম যাতে আর্থিক ও সামাজিক প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে, সেজন্য কতকগুলি বিশেষ কার্যক্রম নেওয়া হয়। তার মধ্যে একটি—বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও বিভাগের বাজেটের অন্তত দশ শতাংশ পূর্বোত্তর রাজ্যগুলির উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবরে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী এই ঘোষণা করেছিলেন।

আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হল এই রাজ্যগুলির জন্য একটি অ-তামাদি কেন্দ্রীয় সম্পদ তহবিল তৈরি করা। এই খাতে নির্দিষ্ট করা অর্থ বিশেষ আর্থিক বছর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তামাদি হয়ে যায় না। এই তহবিলে রক্ষিত অর্থ দ্বারা বিভিন্ন পরিকাঠামোগত, সামাজিক ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণ করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ, সড়ক ও সেতু নির্মাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জল সরবরাহ, স্বচ্ছতা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত নানা প্রকল্প। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর ভাষায়—'My government has also created a pool of non-lapsable funds for the North-east and Sikkim. This pool meant for funding development projects in these states will fill the resource gap in creation of new infrastructure, which is a top priority concern of the 'Union Government'.

পরিশেষে, কেন্দ্র, রাজ্য ও ত্রিস্তর স্থানীয় সরকারের মধ্যে মসৃণ সম্পর্কই ভারতের জাতীয়তা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল কথা। কেন্দ্র-রাজ্য বা আন্তঃরাজ্য সমস্যা মূলত আর্থ-রাজনৈতিক সমস্যা। অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূর না হলে আর্থসামাজিক উন্নয়ন সুদূরপরাহত থেকে যাবে। এই সমস্যা সমাধানের মধ্যেই রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সংহতি ও সুষম বিকাশের চাবিকাঠি।❑

[লেখক প্রাক্তন ডাইরেক্টর জেনারেল, সমাচার, আকাশবাণী এবং প্রাক্তন প্রেস রেজিস্ট্রার, ভারত সরকার।
email id : bandyopk@yahoo.co.in
Website :
www.pradiptobandyopadhyay.com]

দু'দুটো বাছাই পর্ব হয়েছেন পার। অতএব জ্ঞানগত যোগ্যতায় ঘাটতি বোধ হয় নেই আর। তবে আবার কেন এই সাক্ষাৎকার!

আসলে প্রিলি-মেন জেনে নিলো 'ভাঁড়ারের' কথা, সাক্ষাৎকার বুঝে নেবে 'রান্না'-দক্ষতা।

মানে আর্কিমিডিস জানি, সাঁতার জানি না, লাভ কী? ডুবজলে যদি পড়ি, প্রাণে বাঁচবো না। তাই না? এখন ঐ 'সাঁতারের কলা কৌশল শেখাবেন কারা'? অবশ্যই দক্ষ সাঁতারুরা। যাঁরা একাধিকবার উজ্জ্বল ভাবে হয়েছেন পার, পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার পারাবার, দাগ রেখে গেছেন সফলতার।

মনে রাখবেন আপনার হাতে আছে আধ ঘণ্টা। তার মধ্যে বোঝাতে হবে আপনি শুধু মাত্র এক বিশেষ নামধারী ব্যক্তি মাত্র নন। আপনি আপনার লব্ধ শিক্ষা, অভিজ্ঞতা দিয়ে গড়ে তুলেছেন নিজেকে আর আপনার জীবন দৃষ্টিকে। আপনার কিছু বলার আছে, অনেক কিছু করার আছে। কিন্তু এ সব কিছু আপনাকে মেলে ধরতে হবে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের পথ ধরে, নিজস্ব ইচ্ছানুসারে নয়।

সুতরাং এক সূক্ষ্মবুদ্ধিমত্তার কলাকৌশল দাবী করে এই সাক্ষাৎকার। আপনার শ্রমক্ষমতা, স্বপ্ন দেখার সাহস, পারিপার্শ্বিককে প্রভাবিত বা উদ্দীপিত করার দক্ষতা— এক কথায় আপনার অপরিমেয় বৈচিত্রকে তুলে ধরার পথ চেনাবে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন, যেখানে রয়েছেন এক ঝাঁক সুদক্ষ, সফল WBCS অফিসার ও শিক্ষাবিদ। তাঁরা নিজেরা শুরুতে নিচ্ছেন গ্রুমিং লেসন ক্লাস। শেখাচ্ছেন, চলন বলন, ওঠা বসা, বেশভূষা ও অন্যান্য আদব কায়দার বাঞ্ছিত ধরন। তার পর চলছে মক ইন্টারভিউ, সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে তার মূল্যায়ন। নিজেকে আরো শাণিত করে আবার বসছে সবাই মক ইন্টারভিউতে, উন্নতি ঘটছে ধাপে ধাপে। সেই সঙ্গে প্রতিদিন চলছে সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর (Current Affairs) বিষয়ে সকলকে ওয়াকিবহাল করার কাজ।

যাঁদের বিষয় জ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব গঠন বা—সচেতনতার তীক্ষ্ণতাকে আরো ধারালো করা প্রয়োজন, তাঁদের বিশেষ চাহিদার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানের জন্য বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষকেরা আলাদা ক্লাস নিচ্ছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত সাক্ষাৎকারের সময়ে প্রত্যয়ী কণ্ঠে সকলে বলছেন 'আসতে পারি স্যার'? সাফল্যকে তাঁরা তখন দেখছেন তাঁদের দৃষ্টিসীমায়।

২০১৫! হতে পারে ডব্লুবিসিএস প্রত্যাশীদের স্বপ্নপূরণের সাল

সামনে ইন্টারভিউয়ের ভরা মরশুম

২০শে জানুয়ারি প্রকাশিত হল ডব্লুবিসিএস-২০১৩ গ্রুপ-'এ' ইন্টারভিউয়ের রেজাল্ট। ফেব্রুয়ারির মধ্যেই শেষ হবে ইন্টারভিউ। আবার ফেব্রুয়ারিতেই হয়তো প্রকাশিত হবে গ্রুপ-'বি'-এর তালিকা। পরপরই প্রকাশিত হবে গ্রুপ-'সি' ও 'ডি'-এর ফল। তারপর প্রকাশিত হবে ডব্লুবিসিএস-২০১৪ এর ফল। 'এ', 'বি', 'সি' ও 'ডি' — একের পর এক। সেই অর্থে বলা যায়, ২০১৫ সালের বেশিরভাগ সময়টা ধরেই চলবে ইন্টারভিউ। ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার ইতিহাসে এ এক আশ্চর্য সমাপতন। বহু পরীক্ষার্থীর স্বপ্নপূরণ হবে এই ২০১৫ সালে। কিন্তু তার জন্য চাই সঠিক প্রস্তুতি।

ইন্টারভিউয়ের প্রস্তুতি কিন্তু রাতারাতি নেওয়া সম্ভব নয়, এর জন্য দরকার দীর্ঘকালীন প্রস্তুতি। ডব্লুবিসিএস-এ বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলির ওপর সপ্তাহখানেক পড়াশুনা করে ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। কিন্তু ব্যক্তিত্বের গুণাবলীর খামতি পূরণ করতে সময় লাগে। মনোভাব, আত্মবিশ্বাস, মনোবল, ধৈর্য, নেতৃত্বদান ক্ষমতা, আত্মপ্রকাশের দক্ষতা এমনই সব গুণাবলীতে নিজেকে ভূষিত করতে চাইলে যথেষ্ট 'গ্রুমিং' দরকার—যা অল্পকালে সম্ভব নয়। ইন্টারভিউ গ্রুমিংয়ের ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সাফল্যের হার বিস্ময়কর! বিশেষজ্ঞরা সযত্ন প্রশিক্ষণে হাতে কলমে গড়ে তোলেন প্রার্থীদের। মক ইন্টারভিউ আর গ্রুমিং সেশনে নিখুঁত হয়ে ওঠে তারা। মেনসের ফলের জন্য অপেক্ষা নয়—প্রয়োজন এখন প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্তের সদ্ব্যবহার। যোগ্য, সফল, ডব্লুবিসিএস দিগন্তে প্রোজ্জ্বল এক ঝাঁক নক্ষত্রতুল্য ব্যক্তিবর্গের সাহচর্যে শাণিত করুন নিজেকে। হয়ে উঠুন তাদেরই একজন।

WBCS-2013 → **?? আপনার লক্ষ্য কি Gr.-B ??** ← **Personality Test**

বি গ্রুপে ডাক পায় কারা—এ প্রশ্ন সকলের মনে। গ্রুপ-বি কে এক নম্বরে দিলে ডাক পাওয়ার পিছনে না হয় যুক্তি আছে। কিন্তু দশ নম্বরে কিংবা চার-পাঁচ-ছয়ে দিয়ে ডাক পাওয়ার পিছনে যুক্তি কি? কারণ বা নিয়ম যাই হোক না কেন, এই সুযোগকে হেলায় হারালে চলবে না।

মনে রাখতে হবে, গ্রুপ-বি এর ইন্টারভিউ আর তিনটি গ্রুপ হতে একেবারেই আলাদা। গ্রুপ-বি সার্ভিসে মানসিক গুণাবলীর সাথে সাথে সর্বোচ্চ পর্যায়ের শারীরিক সক্ষমতা প্রয়োজন হয়। শুধুমাত্র জিমে গড়া অ্যাথলিট সুলভ চেহারা দিয়ে গ্রুপ-বি এর বৈতরণী পার হওয়া সম্ভব নয়। বি-তে সাফল্যের চাবি হল Body with Brain। মানসিক দৃঢ়তা, অত্যধিক চাপ নেওয়ার ক্ষমতা, দীর্ঘ সময় ধরে একনাগাড়ে কাজ করে যাওয়ার শারীরিক সক্ষমতা—প্রভৃতি গুণাবলীগুলিকে ইন্টারভিউয়ের সময় কথোপকথনের মাধ্যমে আপনাকে পরিস্ফুট করতে হবে। এটা করতে পারা নেহাত সহজ কাজ নয়। একমাত্র অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনই পারে এ সকল অতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলিতে আপনাদের দক্ষ করে তুলতে। গ্রুপ-বি তে পুলিশ সম্পর্কিত বেশ কিছু স্টিরিও টাইপ প্রশ্ন প্রতি বছরই করা হয়। এখানকার মক্ ইন্টারভিউয়ের ক্লাসে যোগ দিলে আপনি সেগুলিও জানতে পারছেন। এটা তথ্য প্রযুক্তির যুগ—যত বেশি তথ্যে আপনি সম্পৃক্ত হবেন, আপনি ততটাই কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ পাবেন। তাই ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার আগে পিছিয়ে না থেকে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকুন, আপনার সাফল্য সুনিশ্চিত করুন।

Academic Association ✆ 9830770440 ✆ 9674478644

The Self Culture Institute, 53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073

Website : www.academicassociation.in • Centre : Uluberia-9051392240 • Birati-8420864304 • Darjeeling-9832041123

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে স্থানীয় সরকার

পঞ্চায়েতিরাজের ব্যাপ্তি ও ভূমিকা

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব ও ভূমিকা আলোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে লেখক স্থানীয় সরকারের উদ্ভব ও প্রাথমিক চিন্তাভাবনা নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা ও চর্চা করেছেন। কোন সময়ে, কোন দেশে, কীসের প্রয়োজনে এই স্থানীয় সরকার নিয়ে ভাবনাচিন্তা আরম্ভ হল এবং তা কীভাবে রূপায়িত হল, তা-ও এক-এক করে তুলে ধরা হয়েছে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রেক্ষাপটেই বা এর আত্মপ্রকাশ ঘটল কবে ও কীভাবে? বর্তমান রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থায় বা তা কতটা কার্যকর তা জানাচ্ছেন **ড. উদয়ভানু ভট্টাচার্য্য।**

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো হল এমন এক শাসনতন্ত্র, যেখানে দেশের সার্বভৌমত্ব সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার—এই দুই ভাগে বিভক্ত। এটি গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়ে থাকে এবং দেশের শাসনক্ষমতা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ভাগাভাগি করে বণ্টিত হয়। ভারতীয় সংবিধানের একাদশ অধ্যায়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক ও ক্ষমতার বণ্টন পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা আছে। আবার গোড়াতে না থাকলেও ১৯৯২ সালে ৭৩ ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারগুলিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দান করা হয়েছে। অর্থাৎ, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কেন্দ্র ও রাজ্য ছাড়াও শাসনতন্ত্রে প্রতিটি রাজ্যে স্থানীয় সরকারগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিশেষ কিছু ক্ষমতা লাভের অধিকারী হয়েছে।

ভারতের শাসনব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বৈশিষ্ট্য, উপযোগিতা, তার ভালো ও মন্দের বিভিন্ন দিক ইত্যাদির আলোচনা ও চর্চা বহুদিন ধরেই বিদগ্ধ ও বিশেষজ্ঞ জনের চিন্তা ও মননের কেন্দ্রবিন্দু। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, আমাদের দেশে শাসনতন্ত্রের মূল কাঠামো যেমন সংবিধানের অলঙ্ঘ্য নির্দেশে চালিত, তেমনি তার বহুকিছুই মূল কাঠামোটিকে বজায় রেখে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সতত পরিবর্তনশীল। এর অন্যতম উদাহরণ "যোজনা কমিশন"-এর বিলোপসাধন ও "নীতি আয়োগ"-এর শুভ প্রবর্তন, যার সবিশেষ লক্ষ্য হল রাজ্যগুলির নিজস্ব সমস্যা ও সম্ভাবনার বিচারবিশ্লেষণের মাধ্যমে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা। এই উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্থানীয় সরকারগুলির অংশগ্রহণ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পৃথিবীর বহু দেশেই এ কথা সত্য বলে প্রমাণিত যে, যাদের জন্য উন্নয়ন, সেই তৃণমূল স্তরের মানুষজনকে সঙ্গে নিয়ে "অংশগ্রহণমূলক" উপায়ে উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা ও প্রণয়ন যদি করা যায়, তবে তা হয়ে ওঠে সঠিক ও সার্বিক উন্নয়ন। তৃণমূল স্তরের সরকার বলতে বোঝানো হয় স্থানীয় সরকারগুলিকে; তাই দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন তথা শাসনতন্ত্রে এদের ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমান নিবন্ধে এই স্থানীয় সরকারগুলির, বিশেষত গ্রামীণ স্থানীয় সরকার, উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যেমন আলোচিত হয়েছে, তেমনি একই সঙ্গে বর্তমান ভারতে তাদের স্থান কোথায়—সে সম্পর্কেও আলোকপাত করবার চেষ্টা হয়েছে।

ইউরোপে স্থানীয় সরকারের বিকাশ

ঠিক কবে থেকে ইউরোপে স্থানীয় সরকার ধারণার উদ্ভব ঘটেছিল তা বলা না গেলেও অনেকে দাবি করেন যে, মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে স্থানীয় শাসন ধারণা প্রাথমিকভাবে গড়ে উঠতে থাকে। তবে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, একদিনে বা বিশেষ কোনও এক সময়ে এই ধারণার পরিপূর্ণ রূপটি গড়ে ওঠেনি, বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী লেগেছে প্রাথমিক ওই চিন্তাভাবনাকে একটু একটু করে আধুনিক আঙ্গিকে রূপদান করতে। আলোচনার সুবিধার্থে উত্তরণের এই সময়কালকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(১) **১০৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত** : এই সময়কালে স্থানীয় সরকারের বিকাশের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উত্তরণগুলি দেখা যায়—

(ক) ইউরোপে সেই সময়ে বরো এবং কমিউনগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠতে থাকে;

(খ) কমিউনের নিজস্ব একটি বিচারালয় স্থাপিত হয়, যেখানে ওই কমিউন সংক্রান্ত বাদবিসংবাদ নিষ্পত্তি হতে থাকে;

(গ) বহির্শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়;

(ঘ) কমিউনের মধ্য থেকে নির্বাচিত আধিকারিকরা প্রশাসনগত বিষয়গুলির দেখাশোনার দায়িত্বে থাকেন; এবং

(ঙ) দেশের শাসক প্রদত্ত সনদের মাধ্যমে কমিউনগুলির নিবন্ধীকরণ শুরু হয়। প্রয়োজনে সনদের পরিবর্তন ঘটিয়ে স্থানীয় সংস্থাগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করার প্রক্রিয়া এই সময়কালে শুরু হয়।

(২) **১২৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত** : এই সময়কালে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে রোমান আইন অনুযায়ী স্থানীয় সংস্থাগুলির নিবন্ধনের প্রক্রিয়া চালু থাকলেও উক্ত আইন রূপায়ণের ক্ষেত্রে জার্মানিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই সময়কালের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলি নিম্নরূপ :

(ক) সম্রাটের যে স্থানীয় শাসনের ওপর কর্তৃত্ব করবার অধিকার আছে তা স্বীকৃত হয়;

(খ) ইম্পিরিয়াল শহরগুলি ক্রমে ক্রমে মুক্ত শহরে পরিণত হয়;

(গ) একটি মতবাদ গড়ে ওঠে যে, শহরগুলির নিজেদের হাতে শাসনকর্তৃত্ব

থাকার বদলে রাষ্ট্রকর্তৃক শাসিত হওয়া অপেক্ষাকৃত ভালো।

(৩) **১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত :** একশত বছরের এই সময়কালকে আধুনিক রাষ্ট্রধারণার সূচনাকাল বলা হয়। এই সময়ের বিভিন্ন উত্তরণগুলি হল :

(ক) বরো এবং কমিউনগুলির মধ্যে একটি সাংবিধানিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং "হাউস অব কমন্স"-এ এদের প্রতিনিধিত্ব স্বীকৃত হয়;

(খ) পুরসভাগুলিকে তার এক্তিয়ারভুক্ত প্রজাসাধারণের কর্তৃত্বের অধিকার দেওয়া হয়;

(গ) জেন বদিন, মঁতেস্ক্যু, জোহান অ্যাসথুসে প্রমুখ রাষ্ট্রচিন্তাবিদেরা এই সময়ে রাষ্ট্র ও স্থানীয় শাসন সংস্থাগুলির মধ্যে পদ্ধতিগত সম্পর্ক স্থাপনের ওপর জোর দিয়ে বিভিন্ন মতবাদের জোরালো প্রচার করেন।

(৪) **১৬৫০ খ্রিস্টাব্দ ও তৎপরবর্তী সময়কাল :** এই সময় থেকেই রাষ্ট্র সম্পর্কে আধুনিক ধ্যানধারণাগুলি বাস্তবের রূপ পরিগ্রহ করে। স্থানীয় সরকার ও রাষ্ট্র—এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে ১৭৭৫ সালে তুর্গো (ফ্রান্স) এবং ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে জেরেমি বেন্থাম (ব্রিটেন) তাদের নিজ নিজ মতাদর্শ প্রকাশ করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বেন্থামের "উপযোগিতাবাদ তত্ত্ব" বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স সহ ইউরোপের অনেক দেশে, আমেরিকায় এমনকি ভারতেও তার প্রয়োগ ঘটে।

ইংরেজি শব্দবন্ধ "লোকাল গভর্নমেন্ট"-এর উদ্‌গাতা হলেন জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৯-১৮৩২)। পরে এই শব্দসমষ্টি ১৮৩৫ সালের ৫ জুন "মিউনিসিপ্যালিটি রিফর্ম বিল" প্রণয়নের সময় হাউস অব কমন্সে লর্ড জন রাসেল কর্তৃক উক্ত বিলের প্রস্তাবনায় উল্লেখিত হয়। বেন্থামের রচনায় স্থানীয় সরকার সম্পর্কে যা যা বলা হয়েছে, তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি নিম্নরূপ :

(ক) সমগ্র রাজনৈতিক চতুঃসীমাকে জেলা, উপজেলা, দ্বিস্তরীয় উপজেলা এবং ত্রিস্তরীয় উপজেলা (tri-subdistrict)—এইরূপে বিভক্ত করতে হবে, যার প্রতিটি তার ঠিক পরবর্তী ধাপের কুড়িটি প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

(খ) প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের তার নিজস্ব নির্বাচিত স্থানীয় কর্তা এবং উপবিধানমণ্ডল থাকবে।

(গ) উক্ত বিধানমণ্ডলগুলি সরকারি নীতির রূপায়ণে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করবে।

(ঘ) উপবিধানমণ্ডল জনকল্যাণমূলক কাজ যেমন করবে তেমনি অপরাধ প্রতিরোধে ও রোগ-মহামারি নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করবে। নিরন্ন আতুরদের সহায়তা দান, শিক্ষা প্রসার ও সম্পত্তি নিবন্ধনের মতো ব্যবস্থাদি গ্রহণে উক্ত বিধানমণ্ডল কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করবে। এই সমস্ত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কর আরোপ ও জমি বিক্রয়ের ক্ষমতা উক্ত কর্তৃপক্ষের থাকবে।

(ঙ) প্রতিটি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নির্দেশ মেনে কাজকর্ম যথাবিহিত পরিচালিত হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তা সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।

(চ) স্থানীয় কর্তা ও উপপরিষদ তাদের কৃত কাজকর্মের জন্য কেন্দ্রীয় পরিষদ ও মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

পরবর্তী পর্যায়ে জন স্টুয়ার্ট মিল উদ্ভাবিত রাষ্ট্রচিন্তা বিষয়ক অন্য একটি তত্ত্বও সমকালে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেছিল।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বর্তমানে আমরা স্থানীয় সরকারের কাঠামো, ক্ষমতার পরিধি, কাজকর্মের ব্যাপকতা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় শাসনতন্ত্রে তার অবস্থান—প্রতিটি বিষয়ে যে উন্নতি দেখতে পাই, তার মূল কাঠামোটি কিন্তু বিভিন্ন সময়কালে বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও মনীষীদের চিন্তা, গবেষণা ও ভাবধারার সম্মিলিত এক রূপ, যা দিনে দিনে শাসনতন্ত্রের কাঠামোকে সমৃদ্ধতর করেছে।

ভারতে স্থানীয় সরকারের ঐতিহাসিক পটভূমি

ভারতে "স্থানীয় সরকারের" ধারণা খুবই প্রাচীন। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর উৎস খননে নিযুক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদরা এই মত প্রকাশ করেছেন যে, সে যুগে এক সুসংবদ্ধ নগরজীবনের অস্তিত্ব ছিল। কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ আবার এই মত পোষণ করেন যে, প্রাচীন ভারতে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে শাসনযন্ত্র পরিচালনার বিষয়টি এক অর্থে যেমন ব্যাপক ও সাফল্যযুক্ত হয়েছিল, তেমনি কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা আধুনিককালের ধারণাকেও টেক্কা দিয়েছিল। ঋগ্‌বেদ, মনুসংহিতা, বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র, উপনিষদ, জাতক ও সতপর্ণ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে স্বয়ংশাসিত স্থানীয় প্রশাসনের অনেক চিত্র পাওয়া যায়। তখন গ্রাম ছিল সরকারের মূল ভিত্তি। গ্রামের কর্তা বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন, যেমন—গ্রামণী, গ্রামভোজিকা, গ্রামিকা, গ্রামপতি, গ্রামভদিনা, ভূজপতি প্রভৃতি। দেশের রাজার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। তাঁর দায়দায়িত্ব ছিল নিম্নরূপ :

(ক) রাষ্ট্রের পক্ষে কর নির্ধারণ ও তা সংগ্রহ করা;

(খ) আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা;

(গ) বিবাদ-বিসংবাদ নিষ্পত্তি করা;

(ঘ) গোচারণ ভূমি রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঙ) রাস্তাঘাট, জলসেচ প্রকল্প প্রভৃতি তৈরি ও মেরামত করা;

(চ) চিকিৎসা ও অন্যান্য দাতব্য কর্মের তদারকি করা।

মৌর্য যুগেও গ্রাম প্রশাসনের মূল ভিত্তিস্বরূপ ছিল। মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্রের প্রশাসন ব্যবস্থার যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে বোঝা যায় যে, সে যুগে শাসন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের নীতিই গৃহীত হয়েছিল।

গুপ্ত যুগে দেখতে পাওয়া যায় যে, গ্রামভিত্তিক সংগঠনগুলি স্থানীয় প্রশাসনের পরিচালনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাদের সম্মতি ব্যতিরেকে কোনও জমির হস্তান্তর বৈধ বলে গণ্য হত না। সেই সময় উক্ত সংগঠনগুলি আইনগত ও প্রশাসনিক—এই দুই প্রকার ক্ষমতাই অর্জন করেছিল। বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন আদালত ছিল এবং সেগুলি গ্রামবাসীরাই স্থাপন করেছিল।

মুঘল আমলেও বাদশাহি শাসনতন্ত্রে স্থানীয় সরকারগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। স্থানীয় প্রশাসনের যাবতীয় দায়দায়িত্ব "কোতোয়াল" পদের ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত ছিল। কোতোয়াল পদাধিকারী তিন ধরনের ভূমিকা পালন করতেন; বিচারক, প্রশাসক এবং শান্তিরক্ষক। কোতোয়াল আবার তাঁর

নিয়ন্ত্রণে থাকা বিভিন্ন মহল্লায় একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিয়োগ করতেন, যার পোশাকি নাম ছিল "মীরমহল্লা"। এই মীরমহল্লা প্রশাসনের নিম্নতম স্তরে কাজ করতেন। তিনি তাঁর অধিক্ষেত্র অঞ্চলের বাড়িঘর ও রাস্তাঘাটের খতিয়ান রাখতেন এবং কবরস্থান, কসাইখানা, আবর্জনা পরিষ্কারকদের আবাসস্থল প্রভৃতি চিহ্নিত করতেন। তিনি বাজার নিয়ন্ত্রণ করতেন, ওজন ও পরিমাপ পরীক্ষা করতেন এবং জিনিসপত্রের দরদামের দিকে লক্ষ রাখতেন। স্থানীয় কর আরোপের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকত।

বহু শতক ধরেই মুঘলদের প্রবর্তিত উক্ত স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা কার্যকরী ছিল। তবে ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে এবং অনিবার্যভাবেই মুঘলদের ব্যবস্থাদি বিলুপ্ত হয়। ব্রিটিশরা তখন এমন এক শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়, যা মূলত ইউরোপীয় ধ্যানধারণার অনুবর্তী ছিল।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতে স্থানীয় সরকার

ভারতে ব্রিটিশ আমলের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠাকালকে অনেকে ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ শহরে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন স্থাপনের ঘটনাকে চিহ্নিত করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের আরম্ভের কালটিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে গেলে ১৭৯৩ সালটিকেই ধরা উচিত, কেন-না ওই বছরে ভারতের তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরে (মাদ্রাজ, কলকাতা ও বোম্বাই) তিনটি স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যাল বা পৌরপ্রশাসন স্থাপন করা হয়।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেমন বেন্থাম প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকারগুলির অবস্থান ও ভূমিকা দেশের শাসনতন্ত্রে প্রয়োগ হতে থাকে, তেমনি ভারতবর্ষেও ব্রিটিশ শাসনকালে ওই তত্ত্ব অনুসারে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশ ঘটে। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেন জেম্‌স মিল। ইনি ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত "ইন্ডিয়া হাউসের" এগ্‌জামিনার ছিলেন এবং ওই সময়কালে তিনি এ দেশের শাসনতন্ত্রে বেন্থামীয় ধারণার প্রয়োগ ঘটান। এর রূপায়ণকল্পে "জেলা আধিকারিক" নামে একটি পদের সৃষ্টি করা হয়, যাঁর ভূমিকা একদিকে যেমন রাজস্ব সংগ্রাহক হবে, অন্যদিকে জেলা আদালতের বিচারক হিসেবেও তাঁকে কাজ করতে হবে। মোটামুটিভাবে এক লক্ষ লোকের দায়িত্বভার এই জেলা আধিকারিকদের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

আবার প্রতি দশ জন "জেলা আধিকারিক"দের কাজকর্ম তত্ত্বাবধানের জন্য একটি "ডিভিশনাল কমিশনার" পদ সৃষ্টি করা হয়। এই পদ্ধতির মুখ্য বৈশিষ্ট্য দুটি হল—(ক) কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব সরাসরি সংগ্রহ করা যেত। এজন্য কর নির্ধারক ও সংগ্রাহক তৃতীয় কোনও ব্যক্তির উপস্থিতি প্রয়োজন হত না; এবং (খ) গ্রামপ্রধানকে তাদের প্রথা, বিশ্বাস ও ধর্ম অনুযায়ী স্থানীয় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিভিন্ন বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে ফেলার ক্ষমতা প্রদান।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোদের পরবর্তী সময়ে যখন ভারতের শাসনভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে সরাসরি ইংলন্ডেশ্বরীর হাতে ন্যস্ত হল, সেই সময়কালে প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্রিটিশরা ভারতের শাসনতন্ত্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আধুনিক ধ্যানধারণার প্রয়োগ ঘটাতে শুরু করে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার হল—

(ক) ১৮৭০ সালে লর্ড মেয়ো বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে আর্থিক নিষ্পত্তির ব্যাপারে একটি উপায় প্রবর্তন করেন। এ ছাড়া অন্য একটি প্রস্তাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কাঠামোগত পরিবর্তনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

(খ) ১৮৭৩ সালে চার্লস ত্রিভেলগান পিরামিড আকৃতির প্রশাসনিক ব্যবস্থা রূপায়ণের পক্ষে সওয়াল করেন, যার সর্বনিম্নে থাকবে গ্রাম এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে "কাউন্সিল"-এর অবস্থান হবে।

(গ) ১৮৮২ সালে লর্ড রিপনের বিখ্যাত রেজলিউশন ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা বলে গণ্য করা হয়। ১৮৮১ সালে রিপন আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতির পক্ষে মত দেন। প্রশাসনের সর্বনিম্ন ধাপটি হবে তালুক বা "তহশিল" এবং তা স্থানীয় বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। স্থানীয় সরকারগুলির প্রশাসনিক স্তরে উন্নয়ন করার প্রয়োজন যেমন স্বীকৃত হয়েছে, তেমনি শিক্ষাবিস্তার তথা অন্যান্য জনপ্রকল্পে এই সংস্থাগুলিকে আরও বেশি করে নিযুক্ত করার প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রয়্যাল কমিশন বিকেন্দ্রীকরণের ওপর তাদের রিপোর্টে স্থানীয় সরকারগুলির কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয় এবং এই মত ব্যক্ত করে যে, একমাত্র উপদেশ দান, পরামর্শ দান ও নিরীক্ষা—এই ক-টি ক্ষেত্র ছাড়া উক্ত সরকারগুলির ওপর অন্যপ্রকার বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ কোনও মতেই কাম্য হয়।

১৯১৮ সালে প্রকাশিত ভারত সরকারের এক রেজলিউশনে স্থানীয় সরকারগুলির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির এক আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সেখানে বলা হয় যে—

(ক) গ্রামে পঞ্চায়েতগুলিকে পুনর্জীবিত করে তুলতে হবে;

(খ) গণতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রেখে স্থানীয় নির্বাচকদের ভোটে নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠ বোর্ড স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা পরিচালনা করবে;

(গ) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের থেকে বোর্ডে সদস্য মনোনীত হবেন;

(ঘ) উক্ত সংস্থার সভাপতি মনোনীত হওয়ার বদলে নির্বাচিত ব্যক্তি হওয়াই ভালো;

(ঙ) বাজেট প্রণয়ন, কর আরোপ, প্রয়োজনীয় কাজ করবার অধিকার প্রদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলিকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন।

স্বাধীন ভারতে স্থানীয় সরকার

স্বাধীন ভারতে নবপ্রণীত সংবিধানে কিন্তু স্থানীয় সরকারগুলিকে রাজ্য সরকারগুলির মতো কোনও সাংবিধানিক মর্যাদা দান করা হয়নি। বরঞ্চ স্থানীয় সরকার গঠন এবং তাদের কাজকর্ম ও দায়দায়িত্বের পরিধি নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। আর্টিকেল ৪০-এ বলা আছে যে, পঞ্চায়েতগুলিকে সংগঠিত করে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে রাজ্যকে যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাদের হাতে তুলে দেবার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হতে হবে। স্থানীয় সরকারগুলিকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়—নগরভিত্তিক স্থানীয়

সরকার এবং গ্রামভিত্তিক স্থানীয় সরকার, যা ভারতে পঞ্চায়েতিরাজ নামে সমধিক পরিচিত। বর্তমান নিবন্ধে কেবল পঞ্চায়েতিরাজ সম্পর্কেই আলোচনা করা হচ্ছে।

ভারতবর্ষে গ্রামীণ সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী সংগঠন হল পঞ্চায়েত। সুদূর অতীতকাল থেকেই এদের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। পঞ্চায়েত কথাটি দুটি শব্দের সমষ্টি—পঞ্চ (অর্থাৎ, পাঁচ) এবং আয়েত (অর্থাৎ, সভা বা পরিষদ)। তখনকার দিনে গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং ভূয়োদর্শী পাঁচজন ব্যক্তিকে নিয়ে গড়ে তোলা হত এমন এক সভা, যা গ্রাম্য জনগোষ্ঠীর সুখ-সুবিধার দিকে বিশেষ লক্ষ রাখত এবং বিবাদ-বিসংবাদ নিষ্পত্তিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করত। উক্ত পাঁচজন প্রবীণ ব্যক্তিকে "নররূপী নারায়ণ"-এর মর্যাদা দেওয়া হত এবং তাঁরা ছিলেন "পঞ্চপরমেশ্বর"। সেই সময়ে পঞ্চায়েতের কর্মপরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত ছিল। একদিকে যেমন পঞ্চায়েতকে প্রশাসনিক ও নির্বাহী কার্যাদি সম্পাদন করতে হত, অন্যদিকে তেমনি উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ও আইন সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপও এর কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই স্মরণাতীত কাল থেকেই পঞ্চায়েত সাধারণ মানুষের মনে নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে এবং বলাই বাহুল্য যে পঞ্চায়েতকে বাদ দিয়ে ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সকল আলোচনাই অসমাপ্ত থেকে যায়। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ ভারতের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে বারবার পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করবার কথা বলেছেন, চুম্বকে যা হল "গ্রাম-স্বরাজ" ও "গ্রাম বিকাশ"। তাই ভারতের সংবিধানপ্রণেতারা আর্টিকেল ৪০ অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

গত শতাব্দীর পাঁচের দশকের সময় থেকেই পঞ্চায়েতের সাংগঠনিক কাঠামো, শাসনতন্ত্রে তার অবস্থান, ব্যবহারিক প্রয়োগবিধি ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য বেশ কয়েকটি কমিশন ও কমিটি গঠিত হয়েছিল, যাদের অন্যতম বিবেচ্য বিষয় ছিল, প্রচলিত ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশ্লেষণ করে কোন পথে দেশের পঞ্চায়েতিরাজকে চালনা করলে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি রূপায়ণ করা সম্ভব হবে এবং দেশের শাসনতন্ত্রে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে পঞ্চায়েতকে যুক্ত করা সহজ হবে। এই উল্লেখযোগ্য কমিটিগুলি হল—

(ক) ১৯৫৭ সালের বলবন্তরায় জি মেহ্‌তা কমিটি;

(খ) ১৯৭৭ সালের অশোক মেহ্‌তা কমিটি;

(গ) ১৯৮৫ সালের জি ভি কে রাও কমিটি; এবং

(ঘ) ১৯৮৬ সালের এল এম সিংভি কমিটি।

কমিটিগুলির গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু সুপারিশ সরকার আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করেছে। আজ যে সারা ভারতে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং এই গ্রামীণ স্থানীয় সরকারকে দেশের সার্বিক উন্নয়নে যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে, তার বীজ পোঁতা হয়েছিল বহু আগেই—ওই বিভিন্ন কমিটিগুলির সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে। ওই বিষয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৮৬ সালের সিংভি কমিটি পরিষ্কার এই মত ব্যক্ত করে যে, ভারতে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন এবং এজন্য সংবিধানে নতুন এক অধ্যায় সংযোজিত করতে হবে। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে ভারত সরকার ১৯৮৯ সালে প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধনের জন্য ৬৪তম বিল সংসদে উত্থাপন করে। লোকসভায় বিলটি পাস হলেও রাজ্যসভায় তা আটকে যায়। ফলে তা পরিত্যক্ত হয়।

৭৩তম সংবিধান সংশোধন আইন, ১৯৯২

পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাংবিধানিক মর্যাদা দানের লক্ষ্যে এবং তাদের কর্মপরিধি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন তথা শাসনতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্যে অবশেষে ১৯৯২ সালে সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনী (পুরসভাগুলির ক্ষেত্রে তা ৭৪তম সংশোধনী আইন) আইন সংসদের উভয় কক্ষে পাস করা হয়। বলা যেতে পারে, স্থানীয় সরকারগুলির এই সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও রক্ষাকবচ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং শাসনতন্ত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। সারা ভারতে প্রতিটি রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়, যার নিম্নতম ধাপে গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থান আর জেলায় জেলা পরিষদ হল সর্বোচ্চ স্তর। এই দুয়ের মাঝে ব্লক স্তরে রয়েছে পঞ্চায়েত সমিতি। এই আইনে বলা হয়েছে যে, পঞ্চায়েতের প্রত্যেক স্তরে সদস্যরা সংশ্লিষ্ট নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে নির্বাচিত হবেন, কখনওই মনোনীত নয়। নির্বাচন হবে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এবং নির্বাচন কার্য পরিচালনার জন্য প্রতিটি রাজ্যে আলাদাভাবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। নির্বাচনে তপশিলি জাতি, উপজাতি, মহিলা ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষজনের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে। এ ছাড়া প্রতি পাঁচ বছর অন্তর রাজ্য অর্থ কমিশন গঠন করতে হবে, যার মূল কাজ হবে আগামী পাঁচ বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও স্থানীয় সরকারগুলির (নগরকেন্দ্রিক ও গ্রামীণ, উভয় প্রকারের জন্য) মধ্যে অর্থ সম্পদের বিলিবণ্টনের এক রূপরেখা তৈরি এবং একই সঙ্গে স্থানীয় সরকারগুলির নিজস্ব সম্পদ কী প্রকারে আহরণ করা যায় (নতুন নতুন ক্ষেত্র সহ), সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা। এ বিষয়ে একাদশ তপশিলের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ৭৩তম সংশোধনী আইনে বলা আছে যে, পঞ্চায়েতিরাজের মাধ্যমে ২৯টি বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম রূপায়ণ করতে হবে। এগুলি আগে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরকে করতে হত। বলাই বাহুল্য, এই বাবদে রাজ্য তথা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কর্মসূচি রূপায়ণ বাবদ প্রচুর অনুদান ও অর্থ পঞ্চায়েতগুলির হাতে পৌঁছেছে এবং গ্রামসংসদ থেকে প্রস্তুত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে। উন্নয়নের গোড়ার কথা যদি হয় যে দেশের সবচাইতে পিছিয়ে থাকা মানুষটার উন্নয়ন, সংবিধান সংশোধনের এই ধারা তাতে যে কিছুটা কার্যকরী ছাপ ফেলতে পেরেছে সেটুকু বোধহয় বলা চলে।

উপসংহার

এ কথা ঠিক যে, স্বাধীন ভারতে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে দেশের স্থানীয় সরকারগুলিকে একদিকে যেমন সাংবিধানিক মর্যাদা দান করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি ওই সরকারগুলির কাজের পরিধি, আকার ও ব্যাপ্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু স্থানীয় সরকারগুলিকে দেশের শাসনতন্ত্রে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে গড়ে তুলতে ও যুক্তরাষ্ট্রীয়

কাঠামোর ভাবধারায় যথার্থভাবে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি সফল করে তুলতে হলে এখনও বহু পথ অতিক্রম করতে হবে। সত্যি বলতে কী, স্থানীয় সরকারগুলির মাধ্যমে একাদশ তপশিলের কোন কোন কাজগুলি রূপায়িত হবে, তা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মর্জির ওপর। মোটামুটিভাবে দেখা গেছে যে, স্থানীয় সরকারগুলির, বিশেষত পঞ্চায়েতিরাজের, মোট ব্যয়ের প্রায় ৯০ শতাংশ রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে "অনুদান" বাবদ আসে। তাদের নিজস্ব আয় সংগ্রহের পরিমাণ সামান্য। স্থানীয় সরকারগুলিকে রাজ্য সরকারের লেজুড় হিসেবে বিবেচনা করার এই প্রয়াস আখেরে কিন্তু তাদের স্বয়ংশাসিত হবার ক্ষেত্রে বড় আঘাত। কেন স্থানীয় সরকারগুলি রাজ্য সরকারের ন্যায় কেন্দ্রের সংগৃহীত রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ পাবে না? কেন স্থানীয় সরকারগুলিকে রাজ্য সরকারের সংগৃহীত রাজস্বের একটা স্থিরীকৃত অংশ দেওয়া হবে না? কেন স্থানীয় সরকারগুলির নিজস্ব আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে কর বসানোর অধিকার ব্যাপকতর হবে না? এই প্রশ্নগুলি কিন্তু আজ আর কেবল অর্থনীতিবিদ বা সমাজতাত্ত্বিকদের চিন্তাধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, এ প্রশ্ন জেগেছে সেই সমস্ত মানুষদের মধ্যে, যাদের প্রাত্যহিক জীবনে কোনও না কোনও প্রয়োজনে স্থানীয় সরকারগুলির দ্বারস্থ হতে হয়। উন্নত বহু দেশে দেখা গেছে যে, স্থানীয় সরকারগুলির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে নিজস্ব পুলিশ বাহিনী, দমকল বাহিনী, এমনকি গণ-পরিবহণের প্রায় সবটাই নিয়ন্ত্রণ করে স্থানীয় সরকার। সেসব দেশে যদি স্থানীয় সরকারগুলি প্রশাসনের বহু কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করে ফেলতে পারে, আমরা তা পারব না কেন? আসলে আমাদের মধ্যে রয়েছে চিন্তার দৈন্য, যে অভিজ্ঞতা আমাদের পূর্বাপর নয়, আমরা সেখানে হাত দিতে সহস্রবার চিন্তা করি। এ ছাড়া বর্তমান শাসনতন্ত্রে কায়েমি স্বার্থের বাধা তো আছেই। তবে একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে পুরোনো সংস্কার ঝেড়ে ফেলা জরুরি, নইলে উন্নয়নের দিক থেকে অন্যান্য দেশের চাইতে আমরা পিছিয়ে পড়ব। মনে রাখতে হবে যে, দেশের সার্বিক উন্নয়নের কর্মকাণ্ডে পঞ্চায়েত তথা স্থানীয় সরকারগুলির প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ যদি না থাকে, যদি ওই সংস্থাগুলি নিয়মযন্ত্রের ফাঁসে আটকে পড়ে, কেবল ঊর্ধ্বস্তরের সরকারের হাতের পুতুল হয়, তবে তা হবে আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বড় আঘাত। দেশের মানুষের কাছে তা কোনও মতেই কাম্য নয়। স্থানীয় সরকারগুলিকে দেশের শাসনতন্ত্রের সঙ্গে এক সুর, তাল ও লয়ে বাঁধাই আজ অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ, যার মধ্যে নিহিত আছে ভারত রাষ্ট্রের যথার্থ সাফল্য। ❑

[লেখক সহযোগী অধ্যাপক, গ্রামীণ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদিয়া।
e-mail : uday.rdenku@gmail.com]

সংশোধন

যোজনা (বাংলা) পত্রিকার জানুয়ারি ২০১৫ সংখ্যায় মিতালি পালধির রচিত "অপুষ্টি, অপরিচ্ছন্নতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন" শীর্ষক নিবন্ধের সারণি-৩ [ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে খোলা জায়গায় মলত্যাগের চিত্র (Census ২০১১), পৃ. ১৮]-এ রাজ্যওয়াড়ী পরিসংখ্যানে ঝাড়খণ্ডের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের শতাংশের হিসাবে ভুলবশতঃ গ্রামের জায়গায় শহরের ও শহরের জায়গায় গ্রামের শতাংশ উল্লেখ করা হয়েছে। সঠিক পরিসংখ্যান হল গ্রামের ক্ষেত্রে ৭৯.৯ শতাংশ ও শহরের ক্ষেত্রে ৩১ শতাংশ।

ভারতের সাত দশকের শাসন বিতর্ক : যুক্তরাষ্ট্র বনাম রাজ্যসংঘ

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাজ্যসংঘের অর্থাৎ মার্কিন দেশের সঙ্গে ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর তথা শাসনব্যবস্থার তফাত অনেক। সত্যি কথা বলতে কী, ভারতের সংবিধান প্রণেতারা যে রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বাঁধেন তা অন্য সমস্ত দেশের থেকে স্বতন্ত্র—আজও এবং সেই সাতচল্লিশ সালেও। তার কারণ আর কিছুই নয়—এদেশের সাংস্কৃতিক, ভাষাগত, আঞ্চলিক ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য। তাই বিকেন্দ্রায়ণ-এর মধ্যেই আছে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব। স্বাধীন ভারতে যে ক-টি রাজ্য, যে সমস্ত সমস্যা ছিল—আজ তা নেই। রাজ্যের বিভাজন ঘটেছে, সমস্যার পরিবর্তন হয়েছে। তাই এই সংবিধান, এই গণতান্ত্রিক কাঠামো একাধারে প্রয়োজনীয়, একদিকে অবধারিত ছিল—লিখছেন **উৎপল চক্রবর্তী।**

সুদীর্ঘ একশো পঁয়ষট্টি দিন এবং এগারোটি অধিবেশনের বিচিত্র তর্ক-বিতর্কের ফলশ্রুতি হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ যে সংবিধান 'নিয়তির অভিসার' থেকে স্বাধীন ভারতের জন্য উঠে এসেছিল, গণপরিষদে সেই খসড়া সংবিধান পেশ করতে গিয়ে বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর বলেছিলেন :

> সুখাবিদা কমিটি এ বিষয়ে স্পষ্ট করে বোঝাতে চায় যে ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে রূপ পরিগ্রহ করবে ঠিকই, কিন্তু সেই যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেওয়ার বিষয়ে রাজ্যগুলি কোনো চুক্তি সম্পাদন করেনি, অর্থাৎ সেই যুক্তরাষ্ট্র এই জাতীয় কোনো চুক্তির পরিণামে গড়ে ওঠেনি, আর ওঠেনি বলেই এই যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকারও কোনো রাজ্যের নেই। এই যুক্তরাষ্ট্র একটি কেন্দ্রীয় সংঘ (ইউনিয়ন), কারণ তা অবিভাজ্য। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য দেশ এবং দেশের জনগণকে হয়তো বিভিন্ন রাজ্যে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু আসলে সমগ্র দেশ এক অখণ্ড, অবিভাজ্য সমগ্র, দেশের জনগণ এক ঐক্যবদ্ধ সত্তা, একই উৎস থেকে আহরিত অভিন্ন এক শাসন-প্রচ্ছায়ে তাদের বাস।[১]

গণপরিষদের বিতর্ক যতই দীর্ঘায়িত হোক না কেন [পরবর্তীতে যে প্রতিবেদনগুলি এগারো খণ্ডে প্রকাশিত এবং যার একাধিক খণ্ডেরই আয়তন গড়ে ১০০০ পৃষ্ঠা], সংবিধান সভা, অনেকটা বাধ্য হয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, স্বাধীন ভারতের সংবিধান হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের, যদিও কেন্দ্রে থাকবে একটি শক্তিশালী সরকার। সমকালীন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে দেশ ভাগের অপ্রতিরোধ্য ফলশ্রুতি হিসেবে উদ্ভূত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিরোধ, খাদ্য সংকটের মোকাবিলা, উদ্‌বাস্তু পুনর্বাসন এবং দীর্ঘ উপনিবেশ শাসনে সৃষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে কেন্দ্রে প্রয়োজন ছিল একটি শক্তিশালী সরকার। ফলে গণপরিষদের সূচনাপর্বে নেহরুর নেতৃত্বে ইউনিয়ন পাওয়ার্স কমিটি গঠিত হলেও, ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ভারত ভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া মাত্র গণপরিষদের সিদ্ধান্তের গতিমুখ এক শক্তিশালী কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।[২]

প্রকৃতপক্ষে ভারতের দীর্ঘ সংবিধানে কোথাও ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। বরং সংবিধানের ১(১) অনুচ্ছেদে ভারতকে অভিহিত করা হয়েছে 'রাজ্যসমূহের একটি ইউনিয়ন' হিসেবে। বিগত সময়ের তাবৎ বিতর্কের সূত্রপাত এখানেই। সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মনে হয়েছিল, ভারতীয় সংবিধানের রাজনৈতিক কাঠামোটি এতই অস্বাভাবিক যে তাকে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যায় না। 'যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের' কিংবা 'সংবিধিবদ্ধ বিকেন্দ্রীকরণ' এই জাতীয় বিবরণ আগ্রহজনক হলেও খুব বেশি উৎসাহিত করে না। সংবিধান সভার সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো বিশেষ তত্ত্ব বা মতের উপর নির্ভর করতে চাননি। তাঁদের মনে হয়েছিল, ভারতের সমস্যাগুলি অনন্য এবং এমনই, পৃথিবীর ইতিহাসে যার মোকাবিলা অন্য কোনো যুক্তরাষ্ট্রকে করতে হয়নি। ফলে পৃথিবীর অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া হল ঠিকই, কিন্তু ভারতের নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর জন্য গড়ে উঠল এক নতুন ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা।[৩] অনেকে মনে করেছেন, এই ব্যবস্থা আসলে 'সহযোগিতা-ভিত্তিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা' এবং ভারতের সংবিধান সভাই প্রথম যারা সূচনা থেকেই এই প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করেছে। এর বৈশিষ্ট্য হল যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক নির্ভরতা, যা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল নীতিকে আঘাত করে না।[৪]

অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিনাগরিকত্বের মতো যুক্তির সমর্থনে অনেকেই মনে করেছেন, প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রের চরিত্র ভারতের মত দেশে অনুপস্থিত। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রায় সব কটি মৌলিক চরিত্র ভারতে বর্তমান রয়েছে বলে মেনে নিয়েও এই প্রশ্ন বারবার উঠে এসেছে যে, ভারতীয় শাসনব্যবস্থা অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত। যে যুক্তিগুলি এক্ষেত্রে প্রদর্শিত হয়েছে তা হল :

(১) ভারতে কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা এবং যুগ্ম তালিকার মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হয়েছে। এর ফলে রাজ্যগুলির চেয়ে কেন্দ্র অনেক বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। এ ছাড়া, যুগ্ম তালিকা-ভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্রের অভিমতকে সংবিধানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে ২৪৯, ২৫০, ২৫২ এবং ২৫৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়েও সংসদ আইন প্রণয়নের অধিকারী।

(২) আইন প্রণয়নের মতো শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রেও ২৫৬, ২৫৭, ৩৬৫ এবং ২৫৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেবার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ক্ষমতা বেশি।

(৩) আর্থিক ক্ষমতার ক্ষেত্রেও ২৬২, ২৬৩, ২৬৮ থেকে ২৭২, ২৭৫ এবং ৩৬০ অনুচ্ছেদে রাজ্যগুলির চেয়ে কেন্দ্রের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

(৪) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যগুলির যে স্বতন্ত্র সংবিধান রয়েছে, ভারতের ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত।

(৫) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভারতের

রাজ্যগুলি রাজ্যসভায় সমসংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাতে পারেন।

(৬) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভারতের সংবিধান সর্বোচ্চ আইন হিসেবে বিবেচিত হয় না, কারণ সংসদ ইচ্ছা করলে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো ছাড়া যে কোনও অংশেরই পরিবর্তন সাধনে সক্ষম।

(৭) সংবিধানের দুষ্পরিবর্তনীয়তা যেমন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, ভারতের ক্ষেত্রে রাজ্যের আইনসভাগুলির চেয়ে সংসদের প্রাধান্য অনেক বেশি।

(৮) যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় রাজ্যগুলির যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র আদালত থাকে, ভারতের ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। এখানে রাজ্যের উচ্চ আদালতের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা চলে।

(৯) রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যপালের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(১০) রাজ্যের নাম, সীমানা ইত্যাদি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কেন্দ্র এককভাবে শক্তিশালী।

(১১) নির্বাচন কমিশন এবং যোজনা কমিশনের মাধ্যমে কেন্দ্র রাজ্যগুলির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে।

(১২) রাজ্য সরকারের মতামত ছাড়াই কেন্দ্র যে কোনও রাজ্যে কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত বাহিনী পাঠাতে পারে।

(১৩) ভারতীয় প্রশাসন কৃত্যক ও ভারতীয় পুলিশ কৃত্যক-এর আধিকারিকরা রাজ্যস্তরে কর্মরত থাকলেও তাদের নিয়ন্ত্রণের চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে কেন্দ্রের হাতে।

(১৪) ভারতের কোনও রাজ্য কেন্দ্রের সঙ্গে চূড়ান্ত মতান্তর সত্ত্বেও ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর এই আপাত বৈপরীত্যগুলি বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়টি আজ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উঠে আসে তা হল, সংবিধান প্রণেতারা পরাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলি একত্রিত করার সময়েই তার আশু সমস্যাগুলি অনুধাবন করেছিলেন এবং সম্ভাব্য সমস্যার মোকাবিলার সম্ভাব্য উপায়গুলি ভারতীয় সংবিধানে যুক্ত করেছিলেন। ফলে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রের সার্বিক চরিত্র যে ভারতের ক্ষেত্রে উপযুক্ত হবে না, এই ধারণার উপরই নির্মিত হয়েছিল ভারতীয় সংবিধান—এটাই তার বিশিষ্টতা এবং নিজস্বতা। যুক্তরাষ্ট্রীয় মতবাদ-এর আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রোনাল্ড ওয়াট তাই ভারতীয় পরিকাঠামোর সমর্থনে লিখেছিলেন যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে, যেখানে সামাজিক বৈচিত্র্যগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী, কানাডা, স্পেন এবং ভারতের মতো দেশে সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় কেন্দ্রীয় স্তরে অতিরিক্ত ক্ষমতা সম্ভাব্য আঞ্চলিকতাবাদ-এর প্রতিরোধের জন্যই একান্ত জরুরি।[৪]

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নতুন বিতর্ক

ভারতের স্বাধীনতার বহু আগেই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গণবিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেছে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী মুহূর্তে এই বিতর্ক নতুন মাত্রা নিয়েছে। কিন্তু ১৯৯০-এর দশকে ভারতে একদলীয় শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই বিতর্ক আরও বিচিত্র আকার ধারণ করেছে এবং ক্রমশ সেই সমস্ত এলাকাগুলিতে রাজ্যের ক্ষমতাকে নতুন করে মূল্যায়নের সামনে এনে দিয়েছে, যেগুলি একসময় কেন্দ্রের একচ্ছত্র ক্ষমতা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

সন্দেহ নেই, এই সময়কালেই ভারত পৃথিবীর অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক, সামরিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু এই সময়েই ভারতে অর্থনৈতিক বৈষম্য—ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান—ব্যাপকতর হয়েছে। এর ফলে ভারতীয় রাষ্ট্র তার ছয় দশকেরও বেশি সময়ের স্বাধীনতার মধ্যেই জীবনযাপনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের মুখোমুখি হচ্ছে, যা তাকে ক্রমশ এমন সমস্যার মুখোমুখি হতে বাধ্য করছে যার মোকাবিলা ভারতের স্বাধীনতার অভিজ্ঞতায় প্রতিনিয়তই নতুন রূপ নিচ্ছে।

আসলে ভারতের সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি থেকে বাণিজ্যিক সংস্কৃতিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি এতই মন্থর যে, এই রূপান্তরের প্রতিটি পর্বেই সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে বাণিজ্যিক মূল্যবোধের একটা প্রচ্ছন্ন সংঘাত তৈরি হচ্ছে। এর ফলে সমাজ এবং রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই বহু স্তরবিশিষ্ট বিতর্কের সূচনা হচ্ছে। পাশাপাশি ভারত বিস্তীর্ণ এলাকায় সমান্তরালভাবে আঞ্চলিকতাবাদ এবং অস্তিত্বজনিত রাজনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। আঞ্চলিকতাবাদের বীজ নিহিত রয়েছে ভারতের বহুমুখী বৈচিত্র্যের মধ্যে, সংস্কৃতিগতভাবে যা তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। যদিও ভারতের ৭৯ শতাংশের বেশি জনসংখ্যা চিহ্নিত হয়েছে হিন্দু হিসেবে, যাঁরা বিশ্বাস এবং লোকাচার-এর প্রশ্নে বহুধাবিভক্ত ও সেইসঙ্গে বর্ণ এবং ভাষার প্রশ্নেও যাঁরা নানাভাবে বিভক্ত। ভারতের ১৪ শতাংশের কিছু বেশি মানুষ মুসলমান হিসেবে সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এবং বাকি জনসংখ্যা জুড়ে রয়েছে খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষ (সারণি-১)।

ধর্মীয় গোষ্ঠীর মতো ভারতের ভাষা-বৈচিত্র্যও কিংবদন্তির মতো। সংবিধান বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বসু হিসাব করে দেখিয়েছিলেন ভারতে সব মিলিয়ে ১৬৩২টি ভাষায় কথা বলেন এদেশের মানুষ।[৫] ১৯৬৭ সালে ২১তম সংবিধান সংশোধনের সময় পর্যন্ত ভারতে ১৪টি আঞ্চলিক ভাষাকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। ৭১তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে অষ্টম তপশিলে সিন্ধি ও নেপালি সহ আরও ৪টি আঞ্চলিক ভাষাকে যুক্ত করা হয়। ২০০৭ সালের শেষ দিকে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২। সারণি-২ থেকে রাজ্যভিত্তিক ভাষাভাষী মানুষের একটা চিত্র পাওয়া যাবে।

ভারতের বিভিন্ন জনগণনা প্রতিবেদনগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সরকারিভাবে স্বীকৃত এই ভাষাগুলির বাইরেও রয়েছে একাধিক আঞ্চলিক ভাষা, যেগুলির বেশ কিছু সরকারি স্তরে স্বীকৃতির জন্য ইতিমধ্যেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠিত হয়েছে বেশ কিছু জন-আন্দোলন। এর ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিকতাবাদের শিকড় রয়েছে তার ভাষাবৈচিত্র্যে, বিভিন্ন জনজাতির জাতিতত্ত্বে অথবা উভয়ের সংমিশ্রণে। ভারতে সাম্প্রতিক অতীতে রাজ্যগুলির পুনর্গঠনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই যুক্তির সমর্থন পাওয়া যাবে। অন্যদিকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে স্বয়ংশাসিত জনজাতি পরিষদ [Tribal Antonomous District Council]-গুলি গঠনের ক্ষেত্রেও জনজাতির জাতিতত্ব আঞ্চলিকতাবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিলে ১৯৮৩ সালে ত্রিপুরার জেলা কাউন্সিল গঠন, দার্জিলিঙের গোর্খা পার্বত্য পরিষদ গঠন কিংবা অসমের বোড়োল্যান্ড আঞ্চলিক পরিষদ এই ক্ষেত্রে বিশেষ নিদর্শন হয়ে আছে। এ ছাড়াও স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কালে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে রাজ্য হিসেবে ঘোষণা কিংবা রাজ্যগুলির পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক স্বশাসনের প্রশ্নগুলি বিশেষভাবে সামনে এসেছে।

প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা-উত্তর আঞ্চলিকতা-বাদের ধরনগুলি বিশ্লেষণ করলে এবং জাতীয়তাবাদের মূলস্রোতে এগুলির আত্তীকরণ পর্যালোচনা করলে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট প্রবণতা উঠে আসে। প্রথমত ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির তেলুগু ভাষাভাষীদের জন্য প্রথম অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্তরে তীব্র বিক্ষোভ এবং ক্রমশ তার প্রশাসনের জন্য প্রথমে ১৯৫৩ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন ও পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জাতীয় স্তরে আঞ্চলিক আন্দোলনের প্রতি এক ধরনের সহমর্মিতা প্রদর্শিত হয়েছে। ১৯৫৫ সালে

পুনর্গঠন কমিটি যে প্রতিবেদন দাখিল করেছিল সেখানেও এই সহমর্মিতার নিদর্শন রয়েছে। এইভাবে মূলত ভাষার ভিত্তিতেই ভারতে ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে রাজ্য পুনর্গঠনের নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৯৫০ সালের মূল সংবিধানে 'এ', 'বি' ও 'সি' এই তিন ধরনের ২৭টি রাজ্যের সংখ্যা হ্রাস করে ১৫ করা হয়েছে। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকের এই প্রবণতার উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রমী নিদর্শন সম্ভবত নাগাল্যান্ড রাজ্য গঠন। নাগা উপজাতিদের দীর্ঘায়িত আন্দোলন এক্ষেত্রে জনজাতির অস্তিত্ব রক্ষার বিশেষ সহায়ক নিদর্শন হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে ১৯৬৬ সালে পাঞ্জাব রাজ্যের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে ভাষা ও ধর্মের সংমিশ্রণ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

দ্বিতীয়ত, ১৯৭০ এবং ১৯৮০-র দশকে রাজ্য পুনর্গঠনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল উত্তর-পূর্ব ভারত। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সংবেদনশীল হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছিল ১৯৭১ সালের উত্তর-পূর্ব ভারত পুনর্গঠন আইন, যার মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ত্রিপুরা ও মণিপুরকে পৃথক রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয় এবং উপরাজ্য মেঘালয়কেও পৃথক রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে উপজাতি অধ্যুষিত জেলা মিজোরাম ও অরুণাচলকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দেওয়া হয়, পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে যেগুলি পৃথক রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এই পর্বেও কোনকানি ভাষাভাষী এলাকা হিসেবে ৮ম তপশিল অনুযায়ী গোয়াকে পৃথক রাজ্যের মর্যাদা দান একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। তবে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে ভাষা অপেক্ষা জনজাতিগুলির বিচিত্র জাতিতত্ত্ব এই পর্বে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

তৃতীয়ত, একবিংশ শতকের সূচনায় মধ্যপ্রদেশ ভেঙে ছত্তিশগড়, বিহার ভেঙে ঝাড়খণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশ ভেঙে উত্তরাঞ্চল এবং সাম্প্রতিককালে অন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙে তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠন বিগত ১৯৯০-এর দশকব্যাপী ভাষা, জাতিতত্ত্ব এবং বিভিন্ন বঞ্চনার সম্মিলিত ফলাফল থেকে উৎসারিত দীর্ঘ আঞ্চলিক আন্দোলনের ফলশ্রুতি। তবে শুধুমাত্র ভাষাজনিত কারণ এক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন সূত্র হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেনি, এ ছাড়াও সরকার গঠিত কোনো কমিশন ছাড়াই আইনসভাগুলির নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস এবং সংবিধান নির্ধারিত জাতিগত শান্তি-চুক্তিগুলিই এই রাজ্য পুনর্গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

আঞ্চলিকতাবাদ বনাম বিচ্ছিন্নতাবাদ

১৯৫০ পরবর্তী ভারতের এই ভাষা ও জাতিগত আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের একাংশের ধারণা হয়েছিল, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দিতে চলেছে, যা ক্রমশ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর আসন্ন ধ্বংসের বীজ বপন করতে বাধ্য।[৬] কিন্তু এই আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক, পরবর্তীতে ভারতীয় ঐক্যের অটুট এবং নিরবচ্ছিন্ন সহাবস্থান তাকে বারবার প্রমাণিত করেছে। ১৯৯৯ সালের লোকসভা

সারণি-১
ভারতে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর ক্রমবিকাশ

ধর্মীয় গোষ্ঠী	জনসংখ্যার শতাংশ						
	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
হিন্দু	৮৫	৮৩.৪৫	৮২.৭৩	৮৩.৩০	৮১.৫৩	৮০.৪৬	৭৯.৬
মুসলমান	৯.৯	১০.৬৯	১১.২১	১১.৭৫	১২.৬১	১৩.৪৩	১৪.২
খ্রিস্টান	২	২.৪৪	২.৬০	২.৪৪	২.৩২	২.৩৪	২.৩৪
শিখ	১.৭৯	১.৭৯	১.৮৯	১.৯২	১.৯৪	১.৮৮	১.৮৭
বৌদ্ধ	০.৭৪	০.৭৪	০.৭০	০.৭০	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭
জৈন	০.৪৬	০.৪৬	০.৪৮	০.৪৭	০.৪০	০.৪১	০.৪১
পারসি	০.১৩	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৮	০.০৬	০.০৬
অন্যান্য	০.৪৩	০.৪৩	০.৪১	০.৪২	০.৪৪	০.৭২	০.৭২

সূত্র : ভারতের বিভিন্ন জনগণনা।

সারণি-২
ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের স্বীকৃত ভাষা ও তার ব্যবহারকারী

ভাষার নাম	ব্যবহারকারীর সংখ্যা (২০০১) (মিলিয়ন হিসাবে)	যে রাজ্যগুলিতে ব্যবহৃত
(১) অসমিয়া	১৩	অসম, অরুণাচলপ্রদেশ
(২) বাংলা	৮৩	পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, অসম, ঝাড়খণ্ড, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
(৩) বোড়ো	১.৪	অসম
(৪) ডোগ্রি	২.৩	জম্মু ও কাশ্মীর
(৫) গুজরাতি	৪৬	গুজরাত, দিউ ও দমন, দাদরা ও নগর হাভেলি
(৬) হিন্দি	২৫৮-৪২২	বিহার, ছত্তিশগড়, দিল্লি, হিমাচলপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, আন্দামান
(৭) কন্নড়	৩৮	কর্ণাটক
(৮) কাশ্মীরি	৫.৫	জম্মু ও কাশ্মীর
(৯) কোনকানি	২.৫	গোয়া
(১০) মৈথিলী	১২.২	বিহার
(১১) মালয়লম্	৩৩	কেরল, লাক্ষাদ্বীপ, পুদুচেরি
(১২) মণিপুরী	১.৫	মণিপুর
(১৩) মারাঠি	৭২	মহারাষ্ট্র, গোয়া, দাদরা ও নগর হাভেলি, দমন ও দিউ
(১৪) নেপালি	২.৯	সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ
(১৫) ওড়িয়া	৩২	ওড়িশা
(১৬) পাঞ্জাবি	২৯	চণ্ডীগড়, দিল্লি, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু, পঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরাখণ্ড
(১৭) সংস্কৃত	০.০০১	উত্তরাখণ্ড
(১৮) সাঁওতালি	৬.৫	বিহার, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা
(১৯) সিন্ধি	২.৫	সিন্ধ (বর্তমানে পাকিস্তানে)
(২০) তামিল	৬১	তামিলনাড়ু, আন্দামান ও নিকোবর, পুদুচেরি
(২১) তেলুগু	৭৪	অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, পদুচেরি, আন্দামান ও নিকোবর
(২২) উর্দু	৫২	জম্মু ও কাশ্মীর, তেলেঙ্গানা, দিল্লি, বিহার, উত্তরপ্রদেশ

সূত্র : ভারতের জনগণনা, ২০০১ ও অন্যান্য।

নির্বাচনের পর নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স (৮ অক্টোবর, ১৯৯৯) তাদের সম্পাদকীয়তে লিখেছিল :

"গত মাসে ৩৬০ মিলিয়ন ভারতীয় জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগ, বিশ্বের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ গণতন্ত্রকে আরও একবার বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে নজরকাড়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করল.....ভারতের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য মাঝে মাঝে ঐক্যের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে প্রতিভাত হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক নির্বাচন আরও একবার প্রমাণ করল, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্ত মতান্তর মিটিয়ে নেবার দায়বদ্ধতাই সমস্ত বৈচিত্র্যকে শক্তির উৎসে রূপান্তর করতে পারে।"[৭]

আসলে, ভারতের আঞ্চলিক আন্দোলনগুলির গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আঞ্চলিক সত্তাগুলির স্বশাসনের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় সম্মিলিত হবার একটি গণতান্ত্রিক চরিত্র রয়েছে। দু-ভাবে এই চরিত্রের প্রতিফলন ঘটে। প্রথমত রাজ্য বা স্থানীয় স্তরে স্বশাসনের জন্য যে রাজনৈতিক দাবিগুলি উদ্ভূত হয়, তাদের জন্মের মধ্যেই থাকে জনসমর্থন সংগ্রহের প্রতিফলন এবং যতদিন এই দাবিগুলি সজীব থাকে একমাত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই তা সম্ভব হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা সত্ত্বেও নবজাত রাজ্য বা স্থানীয় কাউন্সিলগুলি পরিচালিত হয় গণতন্ত্রের নির্ধারিত পদ্ধতিতে। এর ফলে চূড়ান্তভাবে বৃহত্তর গণতন্ত্রের মধ্যেই আসলে সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সাধিত হয়।

এর পাশাপাশি ভারতের বিচিত্র জাতি-সত্তাগুলি, যেমন তামিল, তেলুগু, বাঙালি, শিখ, গুজরাতি, মণিপুরী বা অসমিয়া, আসলে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় একটি প্রাতিষ্ঠানিকতার মধ্যেই রূপ পরিগ্রহ করে, নিজেদের ব্যক্ত করে এবং চূড়ান্তভাবে নিজেদের আত্মরক্ষা করতে পারে ও সেইসঙ্গে নিজেদের অস্তিত্বকে উদ্‌যাপন করতে সক্ষম হয়ে ওঠে। ফলে ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক সত্তাগুলির অন্তর্নিহিত নীতি হিসেবে যে আত্ম-উন্মোচন কাঙ্ক্ষিত থাকে তা সম্ভব হয় এই গণতান্ত্রিক আত্মপ্রকাশের মধ্যে। চূড়ান্তভাবে এই আত্মপ্রকাশ আসলে বিচ্ছিন্নতার সমস্ত শক্তিগুলিকে দুর্বল করে তোলে। এভাবেই ভারতের ভাষাগত, জাতিগত এবং ধর্মীয় বৈচিত্র্য একদিকে যেমন দুশ্চিন্তার কারণ, অন্যদিকে এই বৈচিত্র্য একই সঙ্গে ভারতের শক্তিরও অন্যতম প্রধান উৎস। ইতিহাসের ধূসর পৃষ্ঠাগুলির সামান্য কিছু পিছনে তাকালে দেখা যাবে 'নিয়তির অভিসারে' সমগ্র দেশকে যিনি যাত্রাপথে প্রথম নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সেই জওহরলাল নেহরুর বিশ্লেষণও ছিল প্রায় একইরকম।

চাই স্থানীয় স্তরে ক্ষমতার প্রকৃত হস্তান্তর

ভারতে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে একাধিক কমিটি ও কমিশন। ১৯৮৮ সালে বিচারপতি সারকারিয়ার নেতৃত্বে গঠিত উল্লেখযোগ্য কমিশন তাদের ১৬০০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে ২৫৬টি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দাখিল করেছিলেন। এর মধ্যে অনেকগুলি প্রস্তাব ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। পরবর্তীতে ২০০২ সালে সংবিধানের কার্যকারিতার প্রশ্নে গঠিত হয়েছিল জাতীয় কমিশন। কমিশন তাদের প্রতিবেদনে একই সঙ্গে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলিকে শক্তিশালী করার প্রস্তাব দাখিল করে। তারও পরে ২০০৭ সালে বিচারপতি এম এস পুঞ্জির নেতৃত্বে গঠিত কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কজনিত কমিশন তাদের প্রতিবেদনের প্রথম খণ্ডে একইভাবে সময়োচিত পুনর্বিন্যাসের প্রশ্ন তোলে। সন্দেহ নেই, সাম্প্রতিক অতীতে ভারতের আঞ্চলিক অনুন্নয়ন, আঞ্চলিক চরমপন্থা ইত্যাদি জনিত কারণে অনেক ক্ষেত্রেই রাজ্যের অধিকারে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ নানাবিধ বিতর্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্র এবং রাজ্যের সরকারের রাজনৈতিক ব্যবধান সত্ত্বেও ভারতের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে এই বিতর্কগুলির আশু সমাধান অত্যন্ত প্রয়োজন।

অন্যদিকে ভারতের সার্বিক আর্থ-সামাজিক বিকাশের প্রশ্নে স্থানীয় স্তরে ক্ষমতার প্রকৃত হস্তান্তর এই সময়কালের সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক বিতর্ক। সন্দেহ নেই, ভারতের ৭৩ ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের পথ প্রশস্ত করেছে, স্থানীয় স্তরে উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠান নির্মাণ বাধ্যতামূলক করেছে। পরবর্তীতে তপশিলভুক্ত এলাকায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সম্প্রসারণ আইন এই ব্যবস্থাকে আরও সুদূরপ্রসারী করেছে। ইতিমধ্যেই ভারতে এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার জন্য গঠিত হয়েছে পৃথক মন্ত্রালয়। ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অভিজ্ঞতায় লক্ষ করা গেছে, স্থানীয় স্তরে এই প্রতিষ্ঠানগুলি সচল থাকলে একাধিক সমস্যার মোকাবিলা স্থানীয় স্তরেই সম্ভব। এই প্রতিষ্ঠানগুলির চরিত্র সম্পর্কে এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ভারতের সংবিধানে সার্বিক নির্দেশ থাকলেও বাস্তবে এই প্রতিষ্ঠানগুলি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মুষ্টিমেয় কর্মসূচি রূপায়ণকারী সংস্থা ছাড়া বৃহত্তর অর্থে প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে এ পর্যন্ত সক্ষম হয়ে ওঠেনি। এ বিষয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলির পক্ষ থেকে একাধিক সমীক্ষা সংগঠিত হয়েছে, রাজ্য স্তরে পঞ্চায়েত মন্ত্রকের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হয়েছে একাধিক গোলটেবিল বৈঠক। এ বিষয়ে সাম্প্রতিক-কালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন হল পঞ্চায়েত মন্ত্রকের পক্ষ থেকে ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সমীক্ষা।[৮] এ ছাড়াও ভারতের একাদশ পরিকল্পনা এবং একাদশ অর্থ কমিশন এই প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য পৃথক অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানগুলিকে পর্যাপ্ত দায়িত্ব এবং কর্মচারী হস্তান্তরের পক্ষে জোরালো সওয়াল উপস্থিত করেছে। সহস্রাব্দের উন্নয়ন কর্মসূচিকে সামনে রেখে 'যুক্ত উন্নয়ন' [Inclusive Growth]-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই মুহূর্তে ভারতের কাছে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করা এবং সমান্তরাল প্রতিষ্ঠান-গুলিকে [Parastatals] এই প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যুক্ত করার কোনো বিকল্প আছে বলে মনে হয় না। চূড়ান্তভাবে এই পদক্ষেপ ভারতের 'সহযোগিতাভিত্তিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা'র মডেলকে আরও শক্তিশালী করবে বলেই মনে হয়।❑

[লেখক প্রাক্তন অনুষদ সদস্য, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী, নদিয়া।]

উল্লেখপঞ্জি :

১। বিপান চন্দ্র, মৃদুলা ও আদিত্য মুখার্জী উদ্ধৃত, ভারতবর্ষ : স্বাধীনতার পরে (১৯৪৭-২০০০), আনন্দ, কলকাতা, পৃ : ৬১
২। বিপান চন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ : ৬২
৩। GRANVILLE AUSTIN, THE INDIAN CONSTITUTION, 1966, Page : 186
৪। পূর্বোক্ত, পৃ : ১৮৭
৪। Ronald L. Watts, Comparative Conclusions, Available at : http://www.federation.ch/files
৫। D.D. Basu, Introduction to the Constitution of India, New Delhi : Prentice Hall of India, 1997, Page : 197
৬। Harrison, S, India : the Most Dangerous Decade, Madras, OUP, 1960
৭। Atul Kohlied, The Success of India's Democracy, Cambridge : CUP, 2001
৮। Towards Holistic Panchayati Raj, Twentieth Anniversary Report of the Expert Committee on Leveraging Panchayats for efficient Delivery of Public Goods, Govt. of India, 2013

বিকাশশীল বাজার এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

সম্মুখপ্রসারী দৃষ্টি

দ্রুত বিকাশশীল বাজার অর্থনীতিগুলি বর্তমানে নতুন অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে বিশ্বমঞ্চে উঠে আসছে। ভেঙে যাচ্ছে সনাতন ধ্যানধারণা। দ্রুত পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে এই নবীন শক্তির পারস্পরিক সমীকরণের চালচিত্রটি বর্তমান নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাও। লিখেছেন **অলক শীল।**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন উড্‌সে আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে স্বাক্ষরিত চুক্তির ফলশ্রুতি হিসেবে স্থাপিত হয়েছিল বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার—IMF। এজন্য এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি ব্রেটন উড্‌স প্রতিষ্ঠান নামেও সমধিক পরিচিত।

মার্কিন সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের পুনর্গঠনই ছিল বিশ্বব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের মূল লক্ষ্য ছিল, তিনের দশকের মহামন্দার কবল থেকে মুক্ত করে বিশ্ব অর্থনীতিকে সুস্থিত করে তোলা।

ইউরোপের দ্রুত পুনর্গঠন এবং ১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বর্ণমানকের অবসানের পর বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার মূলত বিকাশশীল দেশগুলির উন্নয়নে মনোনিবেশ করে।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এই দেশগুলি মূলধনের ধারাবাহিকতা ঘাটতিতে ভুগতে থাকে। এর জেরে দু-ধরনের মূলগত খামতি দেখা দেয়। চলতি খাতে ঘাটতির জেরে নির্ভর করতে হয় বিদেশি সঞ্চয়ের ওপর। আবার সঞ্চয়ের ঘাটতির জেরে ভৌত ও সামাজিক পরিকাঠামো নির্মাণে সরকারকে বিপুল খরচ করতে হয়। এর জেরে বাড়ে আর্থিক ঘাটতি। এই আর্থিক ঘাটতি আবার চলতি খাতের ঘাটতিকে আরও বাড়িয়ে তোলে। বিনিয়োগের সাপেক্ষে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের ঘাটতি এবং মোট সঞ্চয়ের সাপেক্ষে সরকারি সঞ্চয়ের ঘাটতি—দ্বিমুখী এই দুর্বলতাই উন্নয়নশীল দেশগুলির বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা।

ঝুঁকি বেশি থাকায় এই দেশগুলিতে বেসরকারি বিনিয়োগ সীমিত। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ঘাটতি মেটাতে তাই এরা বিশ্বব্যাংক ও ADB, IADB, AFDB-র মতো আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে সহজ শর্তে পাওয়া ঋণের ওপর নির্ভর করে থাকে। বিশ্বব্যাংক এই দেশগুলির ভৌত ও সামাজিক পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য বিনিয়োগে আর্থিক সাহায্য দেয়।

বিশ্বব্যাংকের এই আর্থিক সহায়তা দেশীয় মুদ্রায় না হওয়ায় এক্ষেত্রে বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধির ঝুঁকি থেকেই যায়। তবুও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ঋণ সংগ্রহের থেকেও উন্নয়নশীল দেশগুলি বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তাকে বেশি অগ্রাধিকার দেয়। তার কারণ হল, লেনদেন উদ্‌বৃত্তের ঘাটতি পূরণে এই সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারও এক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিতে সহায়তা করে। ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের পর ভারতের বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় মাত্র ১০০ কোটি ডলারে নেমে এসেছিল। লেনদেন উদ্‌বৃত্তের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল সংকট। বিদেশি মুদ্রার ক্রেডিট রেটিং পড়ে যাওয়ায় ভারতের ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েছিল আন্তর্জাতিক মহল। সেসময়েরই ভারত আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের সঙ্গে আর্থিক সমঝোতায় আসে, মেনে নেয় এ সংক্রান্ত কঠিন 'আনুষ্ঠানিকতা'। আর এর জেরেই ভারতীয় অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে সূচনা হয় উদারীকরণের।

এই সময়ে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত দপ্তরের বিদেশি অর্থ বিষয়ক শাখা হাতে থাকা সামান্য বিদেশি মুদ্রার সঠিক ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ঋণের কঠোর নিয়ন্ত্রণের ওপর সবথেকে বেশি জোর দিয়েছিল। বিনিময় হারের ওপর সতর্ক নজর রেখে বিদেশি মুদ্রার যাতে অপব্যবহার না হয়, তা সুনিশ্চিত করতে এজন্য আলাদা বাজেট তৈরি করা হত। জ্বালানি আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশি মুদ্রার সংস্থানের দিকে খেয়াল রাখতে দপ্তরের মধ্যে পৃথক POL (পেট্রোলিয়াম ওয়েল লুব্রিকেন্টস্) ডিভিশন গড়ে তোলা হয়েছিল। বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ডিভিশনের মূল লক্ষ্য ছিল বিদেশি মুদ্রা সঞ্চয় এবং আমদানি নিয়ন্ত্রণ। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ফান্ড ব্যাংক ডিভিশন। এই ডিভিশন বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের কাছ থেকে যত বেশি সম্ভব ঋণ সংগ্রহের চেষ্টা করত। দ্বিপাক্ষিক সহায়তা ডিভিশন প্রয়াস চালাত উন্নত দেশগুলির কাছ থেকে সাহায্য লাভের। বৈদেশিক বাণিজ্যিক ঋণ ডিভিশন বিদেশি ঋণ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত ছাড়পত্র দেবার কাজ করত। তবে মূলধনি বাজারের দরজা বন্ধ থাকায় এ

দেশে বিদেশি বিনিয়োগের কোনও অস্তিত্ব ছিল না।

১৯৯১ সালে লেনদেন উদ্‌বৃত্তের সংকটের পর ভারতীয় অর্থনীতি নিজেকে উন্মুক্ত করে উদারীকরণের পথে হাঁটে। বিদেশি মুদ্রা আজ আর দুর্লভ সম্পদ নয়। বিদেশি মুদ্রা ও POL সংক্রান্ত বাজেট এখন ইতিহাস। বৈদেশিক বাণিজ্যিক ঋণ ব্যবস্থাপনার ভার তুলে দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে। বিদেশী বিনিয়োগ ডিভিশন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার পাশাপাশি গুরুত্ব হারিয়েছে বৈদেশিক বাণিজ্য ডিভিশন। বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠন (WTO)-র সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে বাণিজ্যনীতির রাশ এখন বাণিজ্য মন্ত্রকের হাতে। দ্বিপাক্ষিক ও বহুদেশীয় ডিভিশন এখনও আছে বটে, কিন্তু তাদের সেই গুরুত্ব অন্তর্হিত। পরিবর্তনের হাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখন সময় এসেছে এদের নতুন ভূমিকা খুঁজে বের করার।

সাম্প্রতিক কালে বিশ্ব অর্থনীতিতে যে বিপুল পরিবর্তন এসেছে, তারই প্রতিফলন ঘটেছে দেশীয় অর্থনীতিতে। গত শতকের শেষের দিক থেকে প্রধান বিকাশশীল দেশগুলি, যাদের বিকাশশীল বাজার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তাদের উন্নয়নে গতি আসে। নিজেদের অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করে দিয়ে এরা বৈদেশিক চাহিদার ওপর ক্রমশ বেশি নির্ভর করতে থাকে, যার ফলে চলতি খাতে উদ্‌বৃত্ত বেড়েই চলে। মূলধন আমদানির থেকেও রপ্তানি বেশি করায় জমে ওঠে বিদেশি মুদ্রার বিপুল সঞ্চয়। ভারতের মতো বিকাশশীল বাজারগুলিতে এখনও সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ফারাক থাকা সত্ত্বেও বিপুল মূলধন আসে। যতটা কাজে লাগানো সম্ভব তার থেকেও এই মূলধনের পরিমাণ বেশি। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার এজন্য বেশ কিছু প্রধান গ্রাহককে হারিয়েছে।

আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের দেওয়া ঋণের পরিমাণ কমে যাওয়া চাহিদার দিকের সমস্যা। বিকাশশীল দেশগুলিতে বিদেশি মুদ্রার যে ঘাটতি দেখা যায়, বেসরকারি মূলধন তার অনেকটাই পূরণ করে। তবে কম উপার্জনশীল এবং সমস্যাসংকীর্ণ দেশগুলিতে বেসরকারি মূলধন যেতে চায় না। আবার বিশ্বব্যাংকের দেওয়া ঋণের পরিমাণ কমে যাওয়াটা জোগানের দিকের সমস্যা। কোনও কারণে বিশ্বব্যাংক পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া ক্রমশ কমিয়ে এনেছে এবং দ্রুত বিকাশশীল বাজারগুলির চাহিদার সঙ্গে এর সম্পদ পাল্লা দিতে পারছে না।

বিশ্বব্যাংক ঠিক কেন পরিকাঠামো ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে সরাসরি দারিদ্র্য দূর করার লক্ষ্যে সামাজিক ক্ষেত্র ও জীবিকা সংক্রান্ত প্রকল্পের ওপর বিশেষ জোর দিল, তা স্পষ্ট নয়। সাতের দশকে বিশ্বব্যাংকের নীতি প্রণয়ন দপ্তরের নির্দেশক এবং মানবোন্নয়ন প্রতিবেদনের স্থপতি মেহবুব উল হক এক সাক্ষাৎকারে রবার্ট অ্যাশারকে বলেছিলেন, বিকাশশীল দেশগুলিতে অসাম্য ক্রমশ বাড়তে থাকায় তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন, উন্নয়নের সুফল ঠিকমতো সমাজের নীচের তলার মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। সেজন্য সামাজিক ক্ষেত্র ও জীবিকা সংক্রান্ত প্রকল্পগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়ে দরিদ্র মানুষের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁদের উপার্জন বাড়ানোর চেষ্টা করা দরকার। এই আশঙ্কার বশবর্তী হয়েই ভারতে পূর্বতন সরকার অর্থনৈতিক নীতির অভিমুখ বিকাশের থেকে সরিয়ে সামাজিক সুরক্ষাজাল সৃষ্টি এবং পুনর্বণ্টনের দিকে রেখেছিল।

দারিদ্র্যের আর-এক নাম হল শ্রমিকদের কম উৎপাদনশীলতা। তবে ভারত এখন বুঝছে, যথাযথ পরিকাঠামোর অভাবে মূলধনের উৎপাদনশীলতাও কমে যায়। সামাজিক পরিকাঠামোর অভাব শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়। জীবিকা সংক্রান্ত প্রকল্পগুলি সামাজিক সুরক্ষাজাল হিসেবে চমৎকার, কিন্তু এর মাধ্যমে দারিদ্র্যমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। শিল্পায়ন ও বিশ্বায়নের যুগে এইভাবে ছোট উৎপাদনকারীরা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার যোগ্য হয়ে উঠতে পারে না। ভারতের বিকাশহার সাম্প্রতিক কালে যে কমে গেছে, বিনিয়োগ হ্রাস তার আসল কারণ নয়। এর পিছনে রয়েছে পরিকাঠামোগত ও সরকারি প্রতিবন্ধকতায় বিনিয়োগ থেকে উৎপাদনের হার কমে যাওয়া।

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমানে সম্পদের অভাবে ভুগছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে সম্পদের মূল জোগানদাতা ছিল উন্নত দেশগুলি। কিন্তু তাদের অর্থনীতির বিকাশহার এখন শ্লথ, বিপুল আর্থিক ঘাটতির ভারে তারা নিজেরাই জেরবার। সেজন্য এখন তারা আর নিজস্ব সম্পদ এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে দিতে চায় না। তবে এখনও এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে পরিমাণ সম্পদ আছে তা ধারাবাহিকতার সমস্যায় জর্জরিত, কম উপার্জনের বিকাশশীল অর্থনীতিগুলির আর্থিক চাহিদা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট। ভারত বরাবরই বিশ্বব্যাংকের প্রচুর প্রকল্প পেয়ে এসেছে।

সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক আর্থিক সংকট হঠাৎ করেই আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের গুরুত্বকে বাড়িয়ে তুলেছে। মূলধন প্রবাহের অনিশ্চয়তায় ভুগতে থাকা পৃথিবীতে লেনদেন উদ্‌বৃত্তের ঘাটতি মেটাতে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের সম্পদ তিনগুণ বাড়ানো হয়েছে। বৃহৎ বিকাশশীল বাজারগুলির পর্যাপ্ত সঞ্চয় থাকায় তাদের ততটা ভয় নেই। কিন্তু কিছু উন্নত দেশের অর্থনীতিকে বাঁচাতে সহায়তার প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে ইউরোপের কথা বলা যেতে পারে। বিকাশশীল বাজারগুলিই এখন প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের সম্পদের জোগানদার হয়ে উঠেছে।

এই সংকটের জেরে বিশ্বব্যাংকের দেওয়া ঋণের পরিমাণও বেশ অনেকটা বেড়েছে। বেসরকারি মূলধন তুলে নেওয়ায় লগ্নিক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে, এই ঋণ তা পূরণ করছে। এই সময়ে বিশ্বব্যাংকের পুনর্মূলধনিকরণের মাধ্যমে তার ঋণ প্রদানের ক্ষমতা বাড়ানো উচিত ছিল, কিন্তু G-20 দেশগোষ্ঠী সেই সুযোগ কাজে লাগায়নি। এটা করতে পারলে বিশ্ব অর্থনীতিকে মন্দার কবল থেকে মুক্ত করে উচ্চ বিকাশহারের পথে ফিরিয়ে আনা সহজতর হত।

এখন প্রশ্ন হল, ব্রেটন উড্‌স প্রতিষ্ঠানগুলির সাপেক্ষে উন্নয়নশীল দেশগুলি ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে?

বিশ্বব্যাংকের দিক থেকে দেখলে ভারত সহ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ এখনও তাদের

সবথেকে বড় গ্রাহক। এই দেশগুলির উন্নয়ন, বিশেষত পরিকাঠামো নির্মাণে বিশ্বব্যাংকের অর্থ প্রয়োজন। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট নয়। বিকাশশীল বাজার অর্থনীতিগুলিতে বিদেশি মুদ্রার সঞ্চিত ভাণ্ডার যথেষ্ট স্ফীত। আবার তাদের খরচের অধিকাংশই দেশীয় মুদ্রায় করলেই চলে। তা সত্ত্বেও কেন তারা বৈদেশিক ঋণ নিতে চেয়ে নিজেদের অর্থনীতিকে বাইরের ঝড়ঝাপটার সামনে দাঁড় করায়, তা এক রহস্য। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পরিকাঠামো নির্মাণে সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ সীমিত হওয়ায় মূলধনি প্রবাহের প্রকৃতি মূলত বেসরকারি। দেশীয় বাজার থেকেই এই ঋণ সংগ্রহ করা যায়। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি দুটি দেশের যৌথ উদ্যোগে নির্মিত বিভিন্ন পরিকাঠামো প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ ও তার সমন্বয়সাধনের কাজ করতে পারে।

যাই হোক, বৃহৎ বিকাশশীল বাজার অর্থনীতিগুলিতে দেশীয় ঋণের সাপেক্ষে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা যে নগণ্য, তা আজ এক কঠিন বাস্তব। এজন্য G-20 দেশগোষ্ঠীর উদাসীনতা অনেকটাই দায়ী। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের ধাঁচে বিশ্বব্যাংককে ঢেলে সাজাতে তারা উদ্যোগী হয়নি। আসলে তারা মনে করে, বিশ্বব্যাংককে অর্থ দিলে সেই সম্পদ চলে যাবে বিকাশশীল বাজারগুলিতে। তাতে বিকাশশীল অর্থনীতিগুলি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আবার অন্যদিকে, নিজেদের উন্নয়নগত প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি থাকায় ভারতের মতো বিকাশশীল অর্থনীতিগুলিও উদ্‌বৃত্ত সম্পদ বিশ্বব্যাংককে দিতে পারে না।

একই ধরনের যুক্তি খাটে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের ক্ষেত্রেও, বিশেষত এখন আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের সম্পদ ইউরো জোনের অর্থনীতিকে সংকটের হাত থেকে বাঁচাতে সচেষ্ট। ইউরো জোনের অন্তর্গত দেশগুলির মাথাপিছু আয় কিন্তু দ্রুত বিকাশশীল দেশগুলির মাথাপিছু আয়ের থেকে অনেক বেশি। ভারত ইতিমধ্যে বিদেশি মুদ্রার এক বিপুল ভাণ্ডার গড়ে ফেলেছে। তাই ১৯৯১-এর তুলনায় এবারের বিশ্বজনীন আর্থিক সংকট অনেক বেশি তীব্র হলেও ভারতের গায়ে তার আঁচ বিশেষ লাগেনি। দীর্ঘকালীন মেয়াদে ভারতে মূলধনের নীট প্রবাহ চলতি খাতের ঘাটতিকে ছাপিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। (এক্ষেত্রে অপরিশোধিত তেলের দাম নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।) ভবিষ্যতে ভারত আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের গ্রাহকের বদলে তার সম্পদের জোগানদার হয়ে উঠতে পারে। ইতিমধ্যেই অন্যান্য কয়েকটি বিকাশশীল বাজার অর্থনীতির সঙ্গে ভারতও আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারে বড় অঙ্কের অর্থ রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

সুতরাং এই দুটি ব্রেটন উড্‌স প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ভারত সহ অধিকাংশ বৃহৎ উন্নয়নশীল দেশের কৌশলগত অবস্থান ভিন্ন। ভোটের অধিকারে সমতা, উচ্চপদ—এগুলি সব উন্নয়নশীল দেশের কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সর্বাধিক অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হল প্রতিষ্ঠানের শাসনব্যবস্থা। বিশেষত এমন কোনও প্রতিষ্ঠান, যেখানে বর্তমানে তারা বৃহত্তম ঋণগ্রহীতা এবং ভবিষ্যতে সম্পদের জোগানদাতা। বিকাশশীল বাজার অর্থনীতির দেশগুলিকে আকৃষ্ট করতে চাইলে তাই আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের পরিচালনাগত সংস্কার একান্ত আবশ্যক। বিকাশশীল দেশগুলি যে পরিচালন ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ, সেই বোধ জাগিয়ে তোলা দরকার।

বিশ্বব্যাংকের ক্ষেত্রে অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বিপাক্ষিক স্তরে আবদ্ধ থাকে। নতুন প্রকল্পের মঞ্জুরি, অর্থ প্রদান, প্রকল্প পরিচালনার মতো বিষয়গুলি নিয়েই ভাবনাচিন্তা বেশি হয়। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি বহুপাক্ষিক হওয়া প্রয়োজন। সম্পদ সংগ্রহ, তার ব্যবহার, কার্যকর দক্ষতা, সুরক্ষা, নজরদারি ও পরিচালন ব্যবস্থার দিকে বিশেষ জোর দেওয়া উচিত। এতদিন এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান গ্রাহক ছিল উন্নয়নশীল দেশগুলি। তাই নজরদারি ও নীতিকাঠামো গড়ে তোলা হত তাদের কথা মাথায় রেখে। কিন্তু এখন আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের ঋণ মূলত ইউরোপীয় দেশগুলি নেয়। বিকাশের শ্লথ হার, লেনদেন উদ্‌বৃত্তের ঋণাত্মক জের, আর্থিক ঘাটতি, বিপুল বকেয়া ঋণভার—উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রথাগত এই যাবতীয় সমস্যাই এখন উন্নত দেশগুলিকে ভোগ করতে হচ্ছে। সেজন্যই প্রয়োজন কাঠামোগত সংস্কার ও পরিবর্তনের। উন্নত দেশগুলির প্রাধান্য কমিয়ে পরিচালন কাঠামোর পুনর্বিন্যাস না করলে সংস্কারসাধন সম্ভব নয়। ভারতসহ BRICS গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি G-20-তে এ বিষয়ে সরব হয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বজনগ্রাহ্য সমাধানসূত্রে পৌঁছানো দরকার।

সংক্ষেপে বললে, বিশ্ব জুড়ে রাজনৈতিক অর্থনীতিতে যে পরিবর্তন এসেছে, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে পরিচালন কাঠামোর সংস্কার না হওয়ার কারণেই আজ ব্রেটন উড্‌স প্রতিষ্ঠানগুলির এই দুরবস্থা। এখানে BRICS-এর মতো সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক শক্তির ভোটের ভাগ, এই দেশগোষ্ঠীর বিশ্বজনীন GDP-র ভাগের মাত্র অর্ধেক এবং ক্রয়ক্ষমতার ভাগের এক-তৃতীয়াংশের সামান্য বেশি। পরিচালন ক্ষমতা ভাগ করে নিতে OECD-র (অর্গানাইজেশন ফর ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) অনীহা এক্ষেত্রে এক বড়ো প্রতিবন্ধকতা।

বিকাশশীল বাজারগুলি এখন উদ্‌বৃত্ত সঞ্চয় রাখার জন্য নিজেদের নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা ভাবছে। এভাবেই পূর্ব এশিয়ায় 'চিয়াঙ্গ মাই ইনিশিয়েটিভ' (CMI) এবং এশীয় পরিকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক গড়ে উঠেছে। BRICS দেশগোষ্ঠী স্থাপন করেছে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও কন্টিনজেন্সী রিসার্ভ অ্যারেঞ্জমেন্ট। এগুলি আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাংকের প্রতিস্পর্ধী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ যুদ্ধপরবর্তী সময়ে যেভাবে নিজেদের তুলে ধরেছিল, নতুন অর্থনৈতিক শক্তিগুলি ভূ-রাজনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে সেভাবেই নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারে কি না, তাই এখন দেখার। ❑

[লেখক ভারতীয় প্রশাসনিক সেবা (IAS)-র সদস্য।

email: aloksheel@aloksheel.com]

ডিজিটাল ভারত কর্মসূচি

সরকারি প্রশাসন সংস্কারে নজিরমূলক উদ্যোগ

অর্থনৈতিক মন্দায় জেরবার অধুনা প্রায় গোটা দুনিয়া। বিকাশহারের ধ্বজা উঁচিয়ে রাখতে পেরেছে গুটিকয়েক দেশ। ভারত তাদের অন্যতম। এই হার বৃদ্ধি ধরে রাখতে অর্থনীতির পালে সুপবন জোগাতে সরকার তৎপর। তবে এজন্য দরকার গতানুগতিকতার খোলস ঝেড়ে ফেলে সরকারি প্রশাসনের সংস্কার। সেদিকে নজর দিয়ে ভারত সরকার চালু করেছে ডিজিটাল ভারত কর্মসূচি। লিখছেন **যোগেশ কে দ্বিবেদী, নৃপেন্দ্র পি রানা, এন্টনিস সি সিমিনটিরাস ও বনিতা লাল।**

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে সরকারি প্রশাসন সংস্কার করলে বিভিন্ন পক্ষের জন্য হরেক সুযোগসুবিধে জোগান সম্ভব (দ্বিবেদী ও অন্যান্য ২০১৩)। এহেন সংস্কারের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা বাড়ে। আমলাতান্ত্রিক ফাঁস কমে। যোগাযোগ ও সমন্বয়ের উন্নতি হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এর ফলে সর্বত্র ও সবসময় নাগরিক-কেন্দ্রিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর সরকারি পরিষেবার জোগান ও প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায় (দ্বিবেদী ও অন্যান্য ২০১৩)।

গত নব্বই দশকের শেষাশেষি ই-প্রশাসনের মাধ্যমে ভারতে এই সংস্কারের গোড়াপত্তন। ২০০৬-এ জাতীয় ই-প্রশাসন পরিকল্পনা (এন ই জি পি) চালু হবার পর সংস্কারের গতি বাড়ে। এ সত্ত্বেও, আমাদের দেশ এখনও কেন পিছিয়ে। বিশ্ব ই-প্রশাসন উন্নয়ন সূচকে (রাষ্ট্রসংঘ ই-প্রশাসন সমীক্ষা, ২০১৪) ভারতের স্থান ১১৭টি দেশের পর। যোজনা পত্রিকায় এর আগে এক নিবন্ধে দ্বিবেদী এর বিভিন্ন কারণ চিহ্নিত করেছেন। যেমন—কেন্দ্র, রাজ্য ও জেলা স্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থার খণ্ডীকরণ, সংহত ব্যবস্থার অভাব, যথেষ্ট সংখ্যক সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র (কমন সার্ভিস সেন্টার) না থাকা, সচেতনতার অভাব, ডিজিটাল সাক্ষরতার কম হার, আঞ্চলিক ভাষায় ই-পরিষেবা অমিল, আস্থাহীনতা ও সেইসঙ্গে নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিয়ে আশঙ্কা (দ্বিবেদী ও অন্যান্য ২০১২; রানা ও অন্যান্য ২০১৩)।

ঐ নিবন্ধে অবস্থার উন্নতির জন্য একগোছা সুপারিশও ছিল। যেমন, বর্তমান ব্যবস্থাগুলির ম্যাপ করা, হালফিলকার ব্যবস্থাগুলি সংহত ও সেগুলি মসৃণভাবে কাজে লাগানো, পরিষেবা পৌঁছে দিতে এক মোবাইল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার, ভয়েস-বেস্‌ড মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন-এর বিকাশ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে নাগরিকদের সড়গড় করার জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, দেশের আনাচেকানাচেও সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র গড়ে তোলা। এ ছাড়া, আঞ্চলিক ভাষায় ই-পরিষেবার সংস্থান এবং ভারতের প্রেক্ষিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর সরকারি প্রশাসন সংস্কার কর্মসূচিকে কার্যকর করে তুলতে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় মানুষের আস্থা ও নিরাপত্তা বোধ সৃষ্টি করা দরকার (দ্বিবেদী ও অন্যান্য ২০১৩)।

অধুনা, ভারত সরকার ঘোষিত এর নয়া দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগে উপরের প্রায় সবদিকই ঠাঁই পেয়েছে। এখন এ নিবন্ধে 'ডিজিটাল ভারত কর্মসূচি' নামে পরিচিত এই যুগান্তকারী উদ্যোগটি সাধারণভাবে খতিয়ে দেখা হবে। কর্মসূচিটির সফল রূপায়ণ হলে ভারতের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সরকারি প্রশাসন সংস্কারে এক উল্লেখযোগ্য ও সদর্থক প্রভাব পড়বে।

ডিজিটাল ভারত কর্মসূচির রূপরেখা

এই কর্মসূচি বিভিন্ন মন্ত্রকের এক সম্মিলিত উদ্যোগ। ভারতকে এক ডিজিটাল-ভিত্তিক ও সক্ষম তথ্য সমাজ এবং জ্ঞান অর্থনীতিতে রূপান্তর করা এর লক্ষ্য। জাতীয় ই-প্রশাসন পরিকল্পনার এক বড়সড় নবকলেবর যেন এই কর্মসূচি। বৈদ্যুতিন ও তথ্য-প্রযুক্তি দপ্তরের পরিকল্পিত এই কর্মসূচি বাবদ বরাদ্দের অঙ্ক এক লক্ষ কোটির বেশি টাকা। গত ২০ আগস্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা অনুমোদিত ডিজিটাল ভারত কর্মসূচি ২০১৮-র মধ্যে এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ হাসিল করতে চায়। সরকারের প্রণালী আমূল বদলে নতুন ভাবে ছকা ও ডিজিটাইজ করা এবং সরকারি পরিষেবা ইলেক্ট্রনিকভাবে পাওয়ার ব্যবস্থা করা এই বিরাট উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। সেইসঙ্গে কর্মসংস্থানেও অবদান রাখা।

ডিজিটাল ভারত কর্মসূচির চিন্তাভাবনা তিনটি মূল নিয়ে। এক, প্রত্যেক নাগরিকের জন্য পরিকাঠামোগত সুযোগ। দুই, চাহিদামতো শাসন ও পরিষেবা। তিন, নাগরিকদের ডিজিটাল ক্ষমতায়ন। এক নম্বর রেখাচিত্রে এই তিন ক্ষেত্র তুলে ধরা হয়েছে। আর পরের অনুচ্ছেদগুলিতে এই তিন ক্ষেত্র নিয়ে বিশদ আলোচনা আছে।

প্রত্যেক নাগরিকের জন্য পরিকাঠামোগত সুযোগ এর মধ্যে আছে : নাগরিকদের ডিজিটাল ক্ষমতায়নে সব গ্রাম পঞ্চায়েতে হাই স্পিড ইনটারনেটের ব্যবস্থা, নাগরিকদের

ডিজিটাল আইডেনটিটি, আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নে নাগরিকদের জন্য মোবাইল ফোন ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, কাছাকাছি সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্রের সুযোগ, ইলেকট্রনিক পরিষেবার চল বাড়াতে দেশে এক নিরাপদ ও সুরক্ষিত সাইবারস্পেস গঠন।

চাহিদামতো শাসন ও পরিষেবার মধ্যে পড়ে : বিভিন্ন মন্ত্রক বা দপ্তরের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে এক-জানলা ব্যবস্থায় সহজে হরেক সরকারি পরিষেবার সুযোগ। অনলাইন ও মোবাইল প্ল্যাটফর্ম কাজে লাগিয়ে এহেন পরিষেবা যথাসময়ে পৌঁছে দেওয়া দরকার। ঝামেলা না পুইয়ে তথ্যের সুযোগ পাওয়া নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি নাগরিকের প্রাপ্য হক ক্লাউডে রাখতে হবে। ডিজিটাল সরকারি পরিষেবার ব্যবস্থা করে ব্যবসা-বাণিজ্যে ঝুটঝামেলা হঠানো উচিত। এতে ইলেকট্রনিক ও ক্যাশলেস আর্থিক কারবারের সুবিধে হবে।

নাগরিকদের ডিজিটাল ক্ষমতায়ন জোর দিয়েছে : তাদের ডিজিটাল সাক্ষরতা, যাবতীয় সরকারি নথিপত্র/সার্টিফিকেট ক্লাউডে পাওয়ার ব্যবস্থা, আঞ্চলিক ভাষায় ডিজিটাল পরিষেবা মেলা এবং নাগরিকদের প্রাপ্য সবকিছু ক্লাউডের মাধ্যমে পোর্টেব্‌ল করা।

ডিজিটাল ভারত কর্মসূচি উপরের তিন মূল ক্ষেত্র সফল করতে আবশ্যক ৯টি বিষয়ও চিহ্নিত করেছে।

(১) ব্রডব্যান্ড হাইওয়ে (২) সকলের জন্য মোবাইল সংযোগের সুযোগ, (৩) পাবলিক ইনটারনেট অ্যাকসেস কর্মসূচি, (৪) ই-শাসন : প্রযুক্তির মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা সংস্কার, (৫) ই-ক্রান্তি—পরিষেবার বৈদ্যুতিন জোগান, (৬) সকলের জন্য তথ্য, (৭) বৈদ্যুতিন উৎপাদন, (৮) কর্মসংস্থানের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি, (৯) আর্লি হার্ভেস্ট প্রোগ্রাম (ভারতকে এক ডিজিটাল ক্ষমতাধর সমাজ ও জ্ঞান অর্থনীতিতে রূপান্তর করা এই কর্মসূচির লক্ষ্য)।

ব্রডব্যান্ড হাইওয়ে জাতীয় তথ্য পরিকাঠামোর সমন্বয় এবং সব গ্রাম ও শহরের জন্য ব্রডব্র্যান্ডের ব্যবস্থা করবে। দ্বিতীয় বিষয়টি সকলের জন্য মোবাইল সংযোগের পরিকাঠামো গড়ে তোলার দিকে নজর দেবে। তৃতীয় বিষয়ের লক্ষ্য ২০১৭-র মার্চ নাগাদ দেশের আড়াই লক্ষ গ্রামের উপযুক্ত সংখ্যক সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র স্থাপন এবং পরের দু-বছরের মধ্যে দেড় লাখ ডাকঘরকে বহু-পরিষেবা কেন্দ্রে পরিণত করা। চতুর্থটিতে, বিজনেস প্রসেস রি-এনজিনিয়ারিং ও ই-শাসনের মাধ্যমে সরকার ফর্ম সরল করা, অনলাইন রিপোজিটরি ব্যবস্থার, সার্ভিস ও প্ল্যাটফর্মগুলির সমন্বয়, ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন এবং নাগরিকদের ইস্যু নিয়ে সমস্যা সমাধানে স্বয়ংক্রিয় গণ অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা সংস্কার করার পরিকাঠামো নিয়েছে।

সরকারি পরিষেবা পেতে নাগরিকদের জন্য টাচ পয়েন্টের ব্যবস্থা করা পঞ্চম বিষয়ের দায়িত্ব। ই-ক্রান্তি ব্যবহার করে বৈদ্যুতিন উপায়ে পরিষেবা জোগানো হবে। এর মধ্যে আছে ই-শিক্ষা, ই-স্বাস্থ্য, চাষিদের জন্য উপকরণের অনলাইন বরাতের প্রযুক্তি, নিরাপত্তার জন্য প্রযুক্তি, মোবাইল ব্যাংকিং এবং একটি মাইক্রো এটিএম প্রোগ্রামের মাধ্যমে সকলের জন্য আর্থিক পরিষেবা, ই-আদালত, ই-পুলিশ, ই-মেল। সকলের জন্য তথ্য ষষ্ঠ বিষয়টির আওতাধীন। সরকার অনলাইন তথ্য ও নথিপত্রের ব্যবস্থা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নাগরিকদের হালফিলের খবর দেবার জন্য সামাজিক মিডিয়ার সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ রাখতে তৎপর থাকবে। এজন্য ইতিমধ্যে চালু হয়েছে মাইগভ. ইন পোর্টাল। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে নাগরিকদের জন্য থাকবে অনলাইন মেসেজ।

বৈদ্যুতিন সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রটি সপ্তম বিষয়ের এক্তিয়ারে পড়ে। সরকারের লক্ষ্য দেশেই উৎপাদন করে ২০২০ সাল নাগাদ যাবতীয় বৈদ্যুতিন সাজসরঞ্জামের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন। তবে বর্তমান কাঠামো লক্ষ্য পূরণ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতে বেশ কিছু কর্মসূচির ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। অষ্টম ও ডিজিটাল ভারত কর্মসূচির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক কর্মসংস্থান, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর পরিষেবার ব্যাপক বন্দোবস্ত গড়ে তোলা। আর নবম বিষয়টি হল আর্লি হার্ভেস্ট প্রোগ্রাম—এই কর্মসূচির লক্ষ্য ভারতকে এক ডিজিটাল সমাজ ও জ্ঞান অর্থনীতিতে রূপান্তর করা। মেসেজের জন্য একটি আই টি প্ল্যাটফর্ম, সরকারি ই-গ্রিটিং, সরকারি কার্যালয়ে বায়োমেট্রিক হাজিরা ইত্যাদির জন্য এই কর্মসূচি ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে।

রেখাচিত্র-১
ডিজিটাল ভারত কর্মসূচি : তিনটি প্রধান ক্ষেত্র ও ন'টি বিষয়

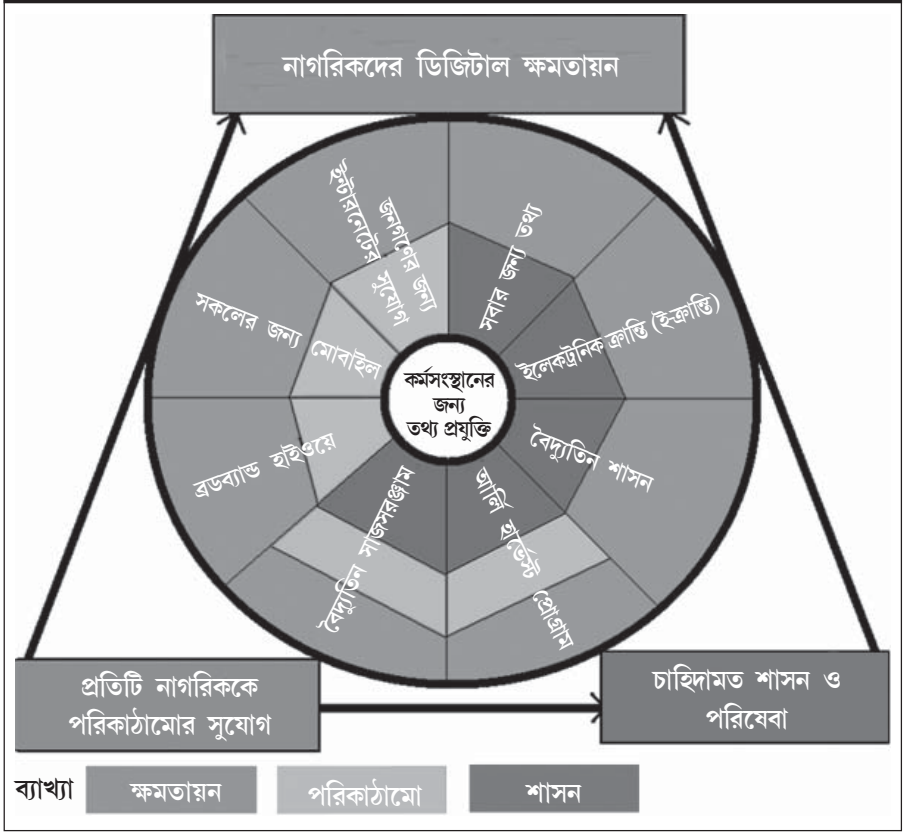

মূল্যায়ন ও সুপারিশ

ডিজিটাল ভারত উদ্যোগের জন্য 'নজিরমূলক' ও 'যুগান্তকারী' কথা দুটি আমরা ব্যবহার করেছি যথেষ্ট ভেবেচিন্তেই। কারণ, আমাদের মতে এই উদ্যোগ 'সার্বিক' এবং শহর-গ্রাম নির্বিশেষে সব দেশবাসীকে অন্তর্ভুক্ত করা।

'সার্বিক' বলতে আমরা বুঝিয়েছি ডিজিটাল ভারত কর্মসূচি যাবতীয় আবশ্যক ও পরস্পর-সংযুক্ত দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। যেমন— পরিকাঠামো উন্নয়ন, সংহত ও স্বচ্ছন্দ বৈদ্যুতিন পরিষেবা এবং নাগরিকদের ডিজিটাল সাক্ষরতা। এক নম্বর রেখাচিত্রে দেখানো হয়েছে, নাগরিকদের প্রকৃত ডিজিটাল ক্ষমতায়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য শাসনের সঙ্গে পরিকাঠামো ও স্বচ্ছন্দ ই-পরিষেবা আবশ্যক। এই প্রধান ক্ষেত্রগুলির কোনও একটিতেও দুর্বলতা থাকলে ভারতকে ডিজিটাল ভারতে রূপান্তরের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে। তাদের প্রাপ্তব্য সম্বন্ধে ব্যবহারকারীদের সচেতনতার অভাব এবং সেই সঙ্গে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা ব্যবহারে প্রয়োজনীয় দক্ষতা না থাকলে পরিকাঠামো ও স্বচ্ছন্দ ই-পরিষেবা মূল্যহীন, ডিজিটাল সাক্ষরতার ক্ষেত্রে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া জরুরি। ডিজিটাল ভারত কর্মসূচি শুধুমাত্র শহরাঞ্চলের উন্নয়নের দিকে নজর রেখে খালাস নয়, এটা সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। বরং গ্রামের মানুষের উন্নতির দিকেই হয়তো নেক নজর। পরিকল্পনা ঠিকঠাক কাজে লাগালে শহর ও গ্রামের মধ্যে 'ডিজিটাল বিভেদ' ভরাতে ইন্টারনেট সংযুক্তি বেশ বড় ভূমিকা নেবে। গড়ে উঠবে সবার জন্য সমতাভিত্তিক তথ্য সমাজ ও জ্ঞান অর্থনীতির বনেদ।

কর্মসূচিটির ব্যাপকতা (পরিসর, বাজেট, সুবিধে, দ্রুত সম্পন্ন করার উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে), ভোল পালটে দেবার গুণ ও সেইসঙ্গে ব্যাপক কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়নে অবদানের কথা মনে রেখে আমরা একে 'যুগান্তকারী' আখ্যা দিয়েছি। ডিজিটাল ভারত কর্মসূচির লক্ষ্য ১.৭ কোটি সরাসরি ও ৮.৫ কোটি পরোক্ষ কর্মসংস্থান। দেশে আগের কোনও ডিজিটাল কর্মসূচি ধারেভারে এর কাছে ঘেঁষতে পারে না। গুগল, মাইক্রোসফ্ট এর মতো বৃহৎ আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ও ন্যাসকম হেন অ্যাসোসিয়েশন তো আর এমনি এমনি এই কর্মসূচি নিয়ে গরজ দেখাচ্ছে না! আর এক দিক থেকেও কর্মসূচিটি যুগান্তকারী— বৈদ্যুতিন বাণিজ্য ও ডিজিটাল বিপণন এর ব্যাপক চল শুরু হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে ভোগ্যপণ্যের খুচরো ব্যাবসা আমূল পালটে যাবে। 'নজিরমূলক' ও 'যুগান্তকারী' হওয়ায় ডিজিটাল ভারত কর্মসূচির গুণকীর্তনে শিল্পমহলের কেষ্টবিষ্টুরা তো একেবারে গদগদ। দেশবিদেশের সংবাদমাধ্যমেও তা জায়গা কেড়ে নিয়েছে। যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হচ্ছে এই কর্মসূচির খবর।

ডিজিটাল ভারত কর্মসূচির রূপায়ণের কাজ এগোনোর পর এর উপকার বোঝা যাবে। এখন ভারতে এক মজবুত ও স্থায়ী সরকার হাল ধরেছে। কর্মসূচির একটা বড় অংশ তাই পরিকল্পনামাফিক সম্পূর্ণ হবে বলে ধরে নেওয়া যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে অগ্রগতি হয়েছে। যেমন আফিস কাছারিতে হাজিরায় বায়োমেট্রিক প্রযুক্তি ধাপে ধাপে চালু করার কাজ এগোচ্ছে ভালোভাবেই। তবে কিনা, ডিজিটাল সাক্ষরতা ও মানব উন্নয়নের মতো দিকে সবাইকে শামিল করতে সময় লাগাটা খুব স্বাভাবিক। দক্ষতার প্রসার ও সচেতনতা এবং মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কখনও শুধুমাত্র বিপুল কর্মকাণ্ড নয়, এক জটিল ব্যাপার। এক্ষেত্রে কাজের কাজ হতে বহু বছর লাগতে পারে। বিশেষ করে গ্রামে ডিজিটাল সাক্ষরতা উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য আমরা এক স্পষ্ট, সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগোনোর সুপারিশ করছি।

নির্দিষ্ট একটা সময়সীমা বেঁধে সবাইকে ডিজিটাল সাক্ষর করে তোলার কোনও জাদুমন্ত্র অবশ্য কারওর হাতে নেই। বিপণনমুখী বিভাজন ও লক্ষ্যের কর্মপন্থা এ কাজ সফল করার হাতিয়ার হতে পারে। রেখাচিত্র ২-এ এক বিপণনমুখী নাগরিক শামিলকরণ কাঠামো (সিমিনটিরাস ও অন্যান্য ২০১৪ থেকে নেওয়া) তুলে ধরা হয়েছে। ডিজিটাল সাক্ষরতা বিস্তারে এটা সাহায্য করতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সাক্ষরতা এবং এই প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন স্তরের ভিত্তিতে নাগরিকদের শ্রেণিবিভাগ করার পক্ষে সওয়াল আছে এই কাঠামোয়।

ডিজিটাল ভারত কর্মসূচি ইনটারনেট সংযুক্তির জন্য ব্রডব্যান্ড, মোবাইল, পাবলিক ইনটারনেট অ্যাকসেস পয়েন্ট এবং সরকারি পরিষেবা পেতে সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্রের ব্যবস্থার কথা বলেছে। ডিজিটাল বিভেদ কমানোর জন্য এসব যথেষ্ট কার্যকরী উপায়। সকলকে ডিজিটাল সাক্ষর করে তোলার উপযুক্ত সোপান। তবে এক্ষেত্রে এক বড় প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করা দরকার। এখনও বহু গ্রামে বিদ্যুৎ অধরা। অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ যখন-তখন চলে যাওয়াটা তো সকলের গা সওয়া। আর ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুতের জোগান ছাড়া ইনটারনেট, সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র তো খোঁড়া। এই ঝামেলা এড়িয়ে লাগাতার বিদ্যুৎ-এর ব্যবস্থা করার জন্য সৌর বা বায়ুশক্তির মতো বিকল্প উৎস কাজে লাগানো উচিত। বাড়তি একটা লাভও হবে। শক্তির বিকল্প উৎস নিয়ে লোকজনের মধ্যে সচেতনতা গড়ে উঠবে।

ডিজিটাল ভারত কর্মসূচিতে 'ম্যাসিভ অনলাইন ওপন কোর্সেস' বিকল্প ও পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার সংস্থান আছে। একেবারে সামনের সারির এই উদ্ভাবনা এখনো ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়নি। এহেন উদ্ভাবনা গ্রহণের জন্য মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো দরকার। এজন্য এই উদ্ভাবনার বিকাশে ব্যবহারকারীদের শামিল করার দিকটি গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া, ব্যাপকভাবে চালু করার আগে এথনোগ্রাফিক গবেষণা ও কয়েকটি বড় পরীক্ষামূলক প্রকল্প হাতে নেওয়া উচিত।

সরকারি বিদ্যালয়ের দশা বেহাল। বিশেষত কম অগ্রসর রাজ্যগুলিতে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে শিক্ষকরা ততটা দড় নন। এহেন পরিস্থিতিতে স্কুলে ব্রডব্যান্ড জুড়লেই সব মুশকিল আসান ভাবাটা ভুল। পড়ুয়াদের শিক্ষাদানের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি কাজে লাগানোর বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। ব্রডব্যান্ড বিস্তারে বিশ্বের অন্যতম অগ্রণী দেশ ব্রাজিল। এক্ষেত্রে ঐ দেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগালে আমাদের ভালো বই মন্দ হবে না। দক্ষিণ কোরিয়ায় ব্রডব্যান্ডের প্রসারে স্কুলের ভূমিকা যথেষ্ট। রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ব ই-শাসন উন্নয়ন সূচক সংক্রান্ত অধুনা এক সমীক্ষা অনুযায়ী দেশটির স্থান ১ নম্বরে। স্কুলে ব্রডব্যান্ড সংযোগ, ই-বইয়ের চল, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষতা সৃষ্টি করলে দেশের ছেলেমেয়েরা 'ডিজিটাল নাগরিক' হতে পারবে। এর ফলে ডিজিটাল ভেদ হঠানো যাবে আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে।

রেখাচিত্র-২
ডিজিটাল সাক্ষরতা বিস্তারের জন্য নাগরিক সামিলকরণ কাঠামো

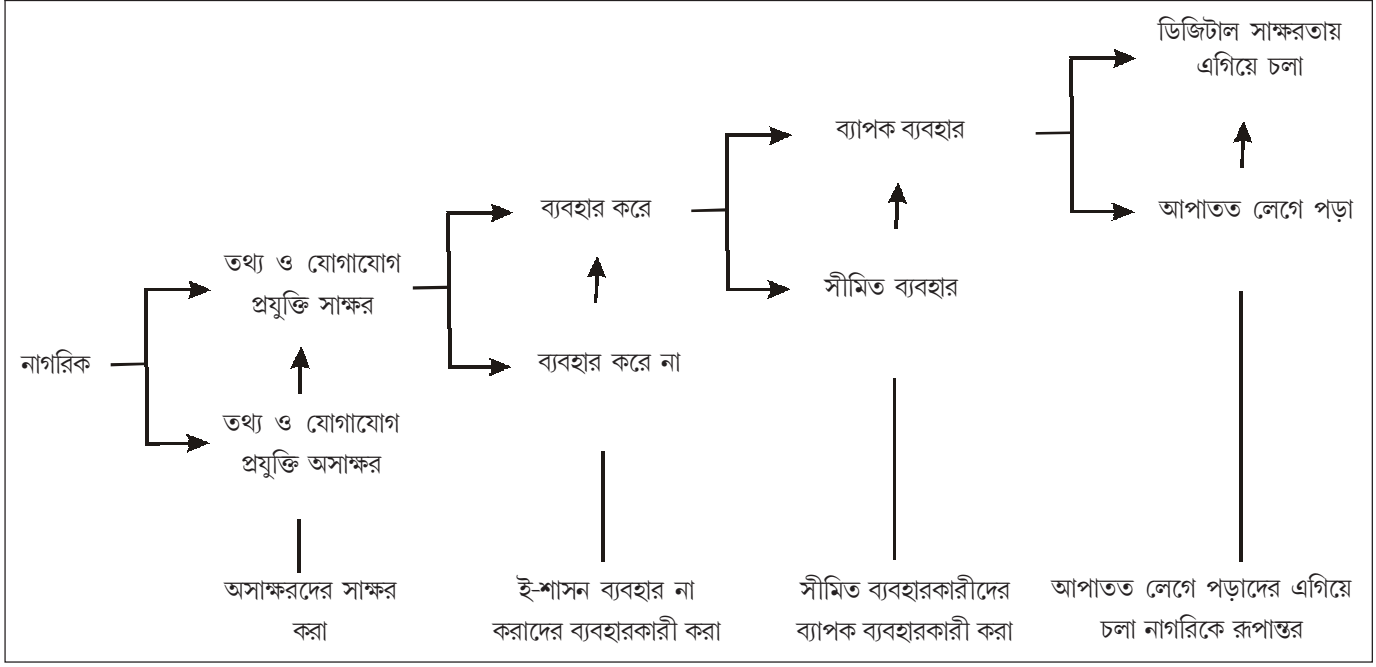

কোন দিকের কাজ সম্পূর্ণ হলে তার মূল্যায়ন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ঘাটতি আছে ডিজিটাল ভারত কর্মসূচিতে। দ্বিবেদী ও অন্যান্যদের কথায় (২০১৩) "বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জন করার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে মূল্যায়ন আবশ্যক। আগামী দিনের বৈদ্যুতিন পরিষেবার বিকাশের জন্য আগের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতেও তা সাহায্য করবে। সঠিক মূল্যায়নের একই রকম ভুলচুক ফের ঘটলে আশ্চর্যের কিছু নেই।" ভারতের দুর্নীতি ছেয়ে আছে আগাপাশতলা। এহেন দেশে ডিজিটাল ভারত কর্মসূচি সঠিক দিশায় এগোচ্ছে কীনা তা সুনিশ্চিত করতে 'নিরপেক্ষ' মূল্যায়ন খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে 'নিরপেক্ষ' বলতে আমরা দেশবিদেশের পণ্ডিত ও গবেষকদের বোঝাচ্ছি। খেদের কথা, এযাবৎ এক্ষেত্রে তেমন কোনও উচ্চবাচ্য নেই।

এই কর্মসূচি প্রযুক্তি বাণিজ্য ও ব্যবস্থাপনা, সমাজ বিজ্ঞানে গবেষক ছাত্রদের অংশগ্রহণ করার এক মূল্যবান সুযোগ দেয়। ইনটারডিসিপ্লিনারি ও ট্রানসডিসিপ্লিনারি গবেষণা চালানোর এক অসাধারণ ও উপযুক্ত পরিবেশ জোগায়। এর দরুন শুধু ডিজিটাল ভারত কর্মসূচির রূপায়ণ হাসিলে সাহায্য হয় ভাবাটা ভুল। ইনটারডিসিপ্লিনারি ও ট্রান্সডিসিপ্লিনারি গবেষকরাও উপকৃত হন। গবেষণা কৃষ্টির বিকাশে তা সাহায্য করে।

আজকের ভারতকে ২০২২-এর মধ্যে 'ডিজিটাল ভারত'-এ পরিণত করার লক্ষ্যে এই রূপান্তর যাত্রার বিষয়ে এখন আমাদের ভাবনাচিন্তা পেশ করছি। ডিজিটাল ভারত কর্মসূচি চালু করে কেন্দ্রীয় সরকার এই রপান্তর যাত্রার একটি পথ খুলে দিয়েছে। এই পথ মোটামুটি মসৃণ, স্বচ্ছন্দ। তবে কোনওভাবেই এটা সিধে সড়ক নয়। আগেই বলেছি কিছু বাধাবিঘ্ন, ঝুটঝামেলা আছে। এসব বাধা কাটাতে এখনও তেমন প্রস্তুত নয় জাতীয় তথ্য কেন্দ্র (এন আই সি)। এজন্য এ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা জরুরি। এছাড়া চূড়ান্ত লক্ষ্য ছোঁওয়ার আগে যাত্রা চালিয়ে যেতে হবে। পথে কোনও শৈথিল্য নৈব নৈব চ। এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ, এই যাত্রাকালে নাগরিকদের লাগাতার ওয়াকিবহাল রাখা উচিত। ডিজিটাল ভারত-এর বাস্তবায়নের জন্য তাদের প্রস্তুত করতে হবে। সড়গড় করতে হবে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে।

ডিজিটাল ভারত কর্মসূচি যথার্থই এক বৈপ্লবিক উদ্যোগ। সবার ডিজিটাল দক্ষতা গড়ে তোলার সুযোগ দিয়ে এই কর্মসূচি সার্বিক সামাজিক অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে। মনে রাখতে হবে, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সব নাগরিকের সামাজিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্য অর্জন মাত্র আংশিকভাবে সম্ভব। গোটা দেশের জন্য তাই এই ডিজিটাল ভারত কর্মসূচি শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি নয়, এক চকমপ্রদ সুযোগ। স্বপ্নকে বাস্তবে হাসিল করতে হলে অবশ্য দেশবাসী ও তাদের অভ্যাস, আচরণ এবং মননে কৃষ্টিগত রদবদল আনা চাই। ডিজিটাল ভারত কর্মসূচির কারিগরদের কাছে সম্ভবত এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অথচ চিত্তাকর্ষক চ্যালেঞ্জ!

নির্দ্বিধায় বলা যায়, কর্মসূচিটি প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হলে ভারত স্থায়ী জাতীয় বিকল্প ধরে রাখতে পারবে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের ক্ষমতা জোরদার করতে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ডিজিটাল ভারত কর্মসূচির কথায় এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ হাতছানি দিচ্ছে ভারতকে। ❑

[ড: লাল নট্টিংহ্যাম ট্রেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনিয়ার লেকচারার। অন্যান্যরা সোয়ানসী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

e-mail : y.k.dwivedi@swansea.ac.uk
n.p.rana@swansea.ac.uk
a.c.simintiras@swansea.ac.uk
banita.lal@ntu.ac.uk]

“কন্যাসন্তানকে বাঁচাও, কন্যাসন্তানকে পড়াও”

দেশ জুড়ে কন্যাসন্তানের প্রতি অযত্ন ও অবহেলা আজ আর নতুন কোনও কথা নয়। অশিক্ষা, স্বাস্থ্যের প্রতি অযত্ন ও অবহেলা এবং অবিচার চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। আজ তা দূর করতে সরকারের পক্ষ থেকে গৃহীত হয়েছে নানা পদক্ষেপ ও কর্মসূচি। ভারত সরকারের নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের একটি প্রতিবেদন।

২০১১ সালের জনগণনার পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে শিশুদের মধ্যে লিঙ্গভেদের আনুপাতিক হার নেমে এসেছে ৯১৮-তে—যা কিনা অতীতের যাবতীয় পরিসংখ্যানের তুলনায় সবচেয়ে কম। পরিসংখ্যানগত এই তথ্য নজরে আসায় শুরু হয়েছে কন্যাসন্তানদের বাঁচিয়ে রাখতে বিভিন্ন সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই সরকার ঘোষণা করেছে “কন্যাসন্তানকে বাঁচাও, কন্যাসন্তানকে পড়াও” ‘বেটী বাঁচাও, বেটী পড়াও’ বা BBBP কর্মসূচিটি। লিঙ্গভেদের আনুপাতিক হার খুব বেশি—এই ধরনের ১০০টি জেলায় ব্যাপক জনপ্রচার অভিযান চালিয়ে এবং সুনির্দিষ্টভাবে সমস্ত রকম ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে এই বিষয়টির মোকাবিলায় কাজ শুরু হয়েছে।

২০১১ সালের জনগণনা সূত্রে প্রাপ্ত শিশুদের মধ্যে লিঙ্গভেদের আনুপাতিক হারকে ভিত্তি করেই এই ১০০টি জেলাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। দেশের সব ক-টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সমীক্ষা চালিয়ে এই জেলাগুলিকে এমনভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে, যাতে প্রত্যেকটি রাজ্যের অন্তত একটি করে জেলাকে এই কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা যায়। জেলাগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে তিনটি মাপকাঠির ভিত্তিতে—(১) জাতীয় গড়ের যে হার তার থেকেও নীচে রয়েছে এমন জেলা (২৩টি রাজ্যের ৮৭টি জেলা এর মধ্যে রয়েছে); (২) জাতীয় গড়ের তুলনায় হার বেশিই রয়েছে অথচ পুত্রসন্তানের তুলনায় কন্যাসন্তানের আনুপাতিক হার ক্রমশ কমে আসছে, এ ধরনের জেলা (৮টি রাজ্যের ৮টি জেলা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) এবং (৩) জাতীয় গড়ের ঊর্ধ্বে রয়েছে এবং অনুপাত বেড়ে চলেছে এমন কয়েকটি জেলা (৫টি রাজ্যের ৫টি জেলাকে এই পর্যায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে)। শেষের যে ৫টি রাজ্যের ৫টি জেলার কথা বলা হল, সেগুলিকে বেছে নেওয়ার কারণ—কন্যাসন্তানের আনুপাতিক হার বৃদ্ধির প্রবণতা যাতে বজায় থাকে তা নিশ্চিত করা এবং অন্যান্য জেলাগুলির কাছে অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে তা তুলে ধরা।

এই জনপ্রচার অভিযান চালাতে এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঘোষিত বাজেটে ১০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। দ্বাদশ যোজনাকালের ‘কন্যাসন্তানদের যত্ন ও সুরক্ষা সংক্রান্ত নানা ধরনের কর্মসূচি’-সম্পর্কিত বাজেট অনুমোদনের আওতায় আরও ১০০ কোটি টাকার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানানো হয়েছে। জাতীয় ও রাজ্য পর্যায়ে ‘শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থাগুলির সামাজিক দায়বদ্ধতা’ কর্মসূচির আওতায় অতিরিক্ত সহায়সম্পদ সংগ্রহের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সমগ্র প্রকল্প বা কর্মসূচিটির রূপায়ণে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ২০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে বর্তমান আর্থিক বছরে (২০১৪-১৫) দেওয়া হবে ১১৫ কোটি টাকা (ছ-মাসের জন্য)। ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরে এই খাতে যুক্ত হবে যথাক্রমে ৪৫ ও ৪০ কোটি টাকা।

এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং এ সম্পর্কিত কাজকর্ম একটু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে—

- কর্মসূচির সামগ্রিক দিকটি হল কন্যাসন্তানের জন্মকে ভালোভাবে এবং আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করার মানসিকতা গড়ে তোলা। সেইসঙ্গে তার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থার মাধ্যমে তাকে বড় হতে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করা। লিঙ্গবৈষম্য পুরোপুরি দূর করে কন্যাসন্তানের জীবন রক্ষা করা, তার সুরক্ষার ব্যবস্থা করা এবং উপযুক্ত লেখাপড়া শিখিয়ে তাকে বড় করে তোলা।
- এই কর্মসূচি রূপায়ণের ওপর নজর রাখতে আটটি বিষয় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। চিহ্নিত ১০০টি জেলায় লিঙ্গানুপাতের ক্ষেত্রে ভারসাম্য যাতে বছরে অন্তত ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায় সেদিকে নজর রাখার বিষয়টিও এর অন্তর্ভুক্ত।
- পাঁচ বছরের কম বয়সি কন্যাসন্তানদের মৃত্যুহার ২০১১ সালের ৮ পয়েন্ট থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে ৪ পয়েন্টে নামিয়ে আনা।
- পাঁচ বছরের কম বয়সি যে সমস্ত মেয়ে কম ওজন এবং রক্তাল্পতার শিকার, তাদের পুষ্টির মান আরও উন্নত করা।

- সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের (ICDS) আওতায় সমস্ত শিশুকেই নিয়ে আসা। সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প এবং জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করা। মা ও শিশুর সুরক্ষা সম্পর্কিত কার্ডের ভিত্তিতে লিঙ্গ নির্বিশেষে সমস্ত শিশুই যাতে সমান যত্ন ও পরিচর্যা পেতে পারে তার সুব্যবস্থা করা।
- মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে মেয়েদের স্কুলে ভরতি ও পঠনপাঠনের হার ২০১৩-১৪ সালের ৭৬ শতাংশ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে ৭৯ শতাংশে উন্নীত করা।
- চিহ্নিত ১০০টি জেলার প্রতিটি স্কুলে ২০১৭ সালের মধ্যে ছাত্রীদের জন্য পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থা করা।
- যৌন অপরাধের হাত থেকে শিশুদের রক্ষা করা সম্পর্কিত ২০১২ সালে রচিত আইন (POCSO) যথাযথভাবে বলবৎ করার মাধ্যমে কন্যাসন্তানদের জন্য সুরক্ষিত পরিবেশ গড়ে তোলা।
- পুত্র ও কন্যাসন্তানদের মধ্যে লিঙ্গানুপাতজনিত বিভেদ বা বৈষম্য কমিয়ে এনে কন্যাসন্তানের নিরাপদ জন্ম, শিক্ষা ও সুরক্ষা সম্ভব করে তুলতে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তৃণমূল স্তরের কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা।

কর্মসূচির এই দিকগুলির বাস্তব রূপায়ণে ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণে যে সমস্ত উদ্ভাবনী ব্যবস্থা ও প্রকৌশলসূত্র ছকে ফেলা হয়েছে তার দিকে এবার দৃষ্টি ফেরানো যাক—

- পুত্রসন্তানের সমান সুযোগ যাতে কন্যাসন্তানও পায় তা নিশ্চিত করতে এবং তাদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সামাজিক কর্মপ্রচেষ্টাকে নিরন্তর করে তোলা এবং সংযোগ ও সচেতনতার প্রসারে প্রচার অভিযানকে জোরদার করে তোলা।
- সুপ্রশাসনের অঙ্গ হিসেবে পুত্র ও কন্যাসন্তানের লিঙ্গানুপাতের বিষয়টি জনসমক্ষে তুলে ধরা।
- চিহ্নিত জেলাগুলিতে কন্যাসন্তানের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা। যে সমস্ত শহর এলাকা এ বিষয়ে এখনও পিছিয়ে রয়েছে, সেখানেও ভারসাম্য বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।
- স্থান ও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এবং নারী ও যুবশক্তিকে সঙ্গে নিয়ে সামাজিক পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে পঞ্চায়েতিরাজ সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তথা তৃণমূল স্তরের কর্মীরা যাতে কাজ করে যেতে পারে, তা নিশ্চিত করতে উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা।
- পরিষেবার প্রসার সম্পর্কিত কাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও কর্মসূচিগুলি যাতে শিশুর অধিকার রক্ষায় এবং লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে তৎপর হয়ে ওঠে, তা সুনিশ্চিত করা।
- জেলা, ব্লক তথা তৃণমূল স্তরে আন্তঃক্ষেত্র এবং আন্তঃপ্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সংযুক্তি ও সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে মূল লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

কর্মসূচির মূল লক্ষ্যপূরণে ছ-টি বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এর একটি হল এই কর্মসূচি সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা অভিযানের আয়োজন করা। চিহ্নিত ১০০টি জেলায় সমষ্টিকে সঙ্গে নিয়ে জাতীয়, রাজ্য এবং জেলা পর্যায়ে এই অভিযানকে সংহত করার কথা বলা হয়েছে। অভিযানের সুফল যাতে দ্রুত লাভ করা যায়, সেজন্য সকলকে সঙ্গে নিয়ে এই অভিযান চালানো হবে। অন্য পদক্ষেপটি হল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সঙ্গে পরামর্শক্রমে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে এই কর্মসূচির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং রাজ্য ও জেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত সুফলকে তুলে ধরে কর্মপ্রচেষ্টাকে আরও সংহত করে তোলার চেষ্টা চালানো হবে। দেখভাল বা নজরদারির সুবিধা হবে, আবার নির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণও সম্ভব হবে—এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রাজ্য পর্যায়ের কর্মী ও অন্যান্যদের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপযোগী একটি নমনীয় কর্মপদ্ধতিও স্থির করবে।

কর্মসূচিটির সামগ্রিক সাফল্যের সোপান হিসেবে পরামর্শ দান, সমষ্টিকে উৎসাহ দান এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। 'নারী কি চৌপল', 'বেটি জন্মোৎসব', 'মন কি বাত' ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনচেতনার প্রসার ঘটিয়ে সমাজের সকলকে এই কর্মসূচি রূপায়ণে অংশ নিতে উদ্‌বুদ্ধ করার ওপর কর্মসূচিটির মূল প্রস্তাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতি বছর ২৪ জানুয়ারি দিনটি বিশিষ্ট জন ও জননেতা, জনসংযোগের কাজে যুক্ত ব্যক্তি, বিধায়ক, সাংসদ সহ জেলা পর্যায়ের সকলকে নিয়ে চিহ্নিত ১০০টি জেলায় জাতীয় কন্যাসন্তান দিবস হিসেবে পালন করা হবে। এ ছাড়াও 'কন্যাসন্তানকে বাঁচাও, কন্যাসন্তানকে পড়াও'—এই বিষয়টি জনসমক্ষে তুলে ধরতে প্রতি মাসের একটি দিনকে নির্দিষ্ট করা হবে। লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে ও লিঙ্গের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখতে এবং সেইসঙ্গে নারী ও কন্যাসন্তানদের ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনেরও উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। শুধু তাই নয়, 'কন্যাসন্তানকে বাঁচাও, কন্যাসন্তানকে পড়াও'—এই কর্মসূচি রূপায়ণে মায়েদের অবদানকেও আন্তর্জাতিক নারী দিবসে তুলে ধরা হবে। জাতীয় কন্যাসন্তান দিবসে কন্যাসন্তানদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা, মূল্য ও শিক্ষা সুনিশ্চিত করার শপথ নিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও কার্যালয়কেও ওই দিন এই শপথ গ্রহণের আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে।❑

যো ❖ জ ❖ না ❖ ডা ❖ য়ে ❖ রি

(১৬ ডিসেম্বর—২০ জানুয়ারি ২০১৫)

বহির্বিশ্ব

● **পেশোয়ারে স্কুলে জঙ্গি হামলা :**

গত ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের পেশোয়ার শহরে এক সেনাস্কুলে তেহ্‌রিক-ই-তালিবান জঙ্গিদের এলোপাথাড়ি গুলি আর আত্মঘাতী বিস্ফোরণে ১৩২ শিশু সহ ১৪৫ জন প্রাণ হারান। পেশোয়ার আর্মি পাবলিক স্কুলে সেনার পোশাক পরা ছয় জঙ্গি আচমকা হামলা করে।

● **ইরাকে মধ্যযুগীয় নৃশংসতা :**

জঙ্গি গোষ্ঠীর সদস্যদের বিয়ে করতে অস্বীকার করায় আইএস জঙ্গিদের হাতে ১৫০ জন মহিলা এ পর্যন্ত খুন হয়েছেন। প্রশাসন সূত্রে বলা হয়েছে, ইরাকে আনবার প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় চড়াও হয়ে জঙ্গিরা বেছে বেছে মহিলাদের হত্যা করেছে।

● **মৃত্যুদণ্ড ফিরে এল জর্ডনে :**

দীর্ঘ ৮ বছর পর প্রাণদণ্ড ফিরিয়ে আনা হল পশ্চিম এশিয়ার দেশ জর্ডনে। ২০০৬ সালে এই দেশ থেকে মৃত্যুদণ্ড প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কী কারণে আবার তা ফিরিয়ে আনা হল তা প্রশাসন সূত্রে বলা হয়নি। আর ২১ ডিসেম্বর প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা নতুন করে চালুর সঙ্গে সঙ্গে ১১ জন অভিযুক্তকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইনটারন্যাশনাল জর্ডন সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছে।

● **সুনামির এক দশক :**

সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস 'সুনামি'-র তাণ্ডবের পর দীর্ঘ এক দশক অতিক্রান্ত। কিন্তু মৃত্যু ও ধ্বংসের সেই বিক্ষত স্মৃতি আজও জেগে বিশ্ববাসীর মনে। ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বরের সেই ভয়ংকর 'সুনামি'-র তাণ্ডবে নিহত কয়েক লক্ষ মানুষের, স্মৃতির স্মরণে বিশ্বজুড়ে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ২০১৪-র ২৬ ডিসেম্বর। উল্লেখ্য, এক দশক আগে ভূমিকম্পে ফাটল ধরেছিল সমুদ্রের গভীর তলদেশের চ্যুতিরেখায়। রিখটার স্কেলে কম্পাঙ্কের মাপ ছিল ৯.১। এরই ফলে প্রায় ৫৭ ফুট উঁচু হয়ে সমুদ্রের জল ধেয়ে এসেছিল পাড়ের দিকে। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল প্রভাবিত দেশগুলির উপকূলবর্তী এলাকার সবকিছু। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড ও ভারত। সরকারি হিসেবে মৃতের সংখ্যা ২ লক্ষ ২৭ হাজারেরও বেশি। কয়েক হাজার মানুষ আজও 'নিখোঁজ'।

● **'আত্মঘাতী ড্রোন' পরীক্ষা ইরানে :**

সামরিক কুচকাওয়াজে 'আত্মঘাতী ড্রোন' পরীক্ষা করা শুরু করল ইরান। পারস্য উপসাগরের মুখে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হোরমুজ খাঁড়ির কাছে চলা সামরিক কুচকাওয়াজে প্রথম এই 'ড্রোন' পরীক্ষা করা হল। প্রায় ৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটার নিয়ে চলা এই কুচকাওয়াজ ইরানের পেশি প্রদর্শনের চেষ্টা বলেই আন্তর্জাতিক মহল মনে করে।

● **ফের নিখোঁজ যাত্রীবিমান :**

গত মার্চে মালয়েশিয়ার এম এইচ-৩৭০-এর ঘটনা মনে করিয়ে দিয়ে ২৮ ডিসেম্বর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আকাশে ফের নিখোঁজ হল যাত্রীবাহী বিমান। ১৫৫ জন যাত্রী ও ৭ জন বিমানকর্মীকে নিয়ে ইন্দোনেশিয়া থেকে সিঙ্গাপুর যাওয়ার পথে হারিয়ে গেল এয়ার এশিয়ার কিউ জেড-৮৫০১। সমুদ্রে তল্লাশি চালিয়ে নিখোঁজ এয়ারবাস এ-৩২০ মডেলের বিমানটির ধ্বংসাবশেষের হদিস মেলে। সংবাদে প্রকাশ, ২৮ ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার সুরাবায়ার জুয়ান্ডা বিমানবন্দর থেকে স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে পাঁচটায় রওনা হয় এয়ার এশিয়ার ওই বিমানটি। সাড়ে সাতটা নাগাদ বিমানটির সঙ্গে এটিসি-র সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

● **আগুনের গ্রাসে ইতালীয় জাহাজ :**

২৮ ডিসেম্বর গ্রিসের জলসীমার মধ্যে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি ইতালীয় জাহাজে। আটলান্টিক মহাসাগরের নর্মান অ্যাটল্যান্টিক নামে ওই জাহাজটিতে যাত্রী ও কর্মী মিলিয়ে ছিলেন মোট ৪৬৬ জন। নৌবাহিনীর অসামান্য তৎপরতা ও দক্ষতার কারণে ৪৫৯ জনকেই জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়। সাত জন প্রাণ হারান। জাহাজটি গ্রিক বন্দর পাট্রাস থেকে ইতালির আঙ্কোনা বন্দরের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু গ্রিসের অন্তর্গত কোরফু দ্বীপপুঞ্জের ৪৪ নটিক্যাল মাইল উত্তর-পশ্চিমে থাকার সময় জাহাজটিতে আগুন লাগে বলে সংবাদসূত্রে প্রকাশ।

● **প্যারিসে পত্রিকার দপ্তরে জঙ্গি হানা :**

প্যারিস থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কার্টুন পত্রিকা 'শার্লি এবদো'-র দপ্তরে বেপরোয়া হামলা চালিয়ে সাংবাদিক ও পুলিশকর্মী সহ মোট ১২ জনকে হত্যা করল দুই মুখোশধারী বন্দুকবাজ। নিহতের তালিকায় পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ও বিশ্বখ্যাত কার্টুনিস্ট স্তেফান শার্বোনিয়ার (শার্ব নামেই খ্যাত) রয়েছেন।

● **শ্রীলঙ্কায় পালাবদল :**

দশ বছর একটানা শাসনের অবসান ঘটল শ্রীলঙ্কায়। নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি মাহিন্দা রাজাপক্ষে তারই প্রাক্তন সহযোগী মৈত্রীপালা সিড়িসেনার হাতে বিপুল ভোটের ব্যবধানে হেরে গেলেন। মোট ভোটের ৫১ শতাংশের বেশি ভোট সিড়িসেনার পক্ষে যাওয়ায় তাঁকে জয়ী ঘোষণা করে শ্রীলঙ্কার নির্বাচন কমিশন।

● **সন্ত্রাসের ভয়ংকর রূপ নাইজিরিয়ায় :**

৯ এবং ১০ জানুয়ারি নাইজিরিয়ার বাগা শহরে বোকো হারাম জঙ্গি গোষ্ঠী সন্ত্রাসের যে নমুনা পেশ করল, তার ভয়াবহতা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইনটারন্যাশনাল জানিয়েছে। অ্যামনেস্টির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নাইজিরিয়ার বাগা শহরের কাছে ঝোপের মধ্যে পড়ে আছে সার সার মৃতদেহ। মৃতদের অধিকাংশই শিশু, মহিলা ও বয়স্ক। নিহতের সংখ্যা কমপক্ষে ২০০০। ২০১৩-র মার্চে মাইদুগিরি শহরের জিওয়া সামরিক ছাউনিতে বোকো হারাম এমনই মারণযজ্ঞ চালিয়েছিল। সে বার মারা যান ৬০০ জন। কিন্তু এবারের আক্রমণ এমন সময় এল যখন নাইজিরিয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন মাত্র ৫ সপ্তাহ দূরে।

● **পাঁচ বিদেশির প্রাণদণ্ড ইন্দোনেশিয়ায় :**

মাদক চোরাচালানের অভিযোগে ইন্দোনেশিয়ায় গুলি করে হত্যা করা হল পাঁচ বিদেশিকে। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত (ইন্দোনেশিয়ায় ফাঁসির বদলে গুলি) বিদেশিদের মধ্যে ছিলেন ব্রাজিল, নেদারল্যান্ড, ভিয়েতনাম, মালাউরি ও নাইজিরিয়ার একজন করে নাগরিক। মাদক পাচারের দায়ে এভাবে 'একতরফা' বিচার চালিয়ে তাদের নাগরিককে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করানোর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ব্রাজিল ও নেদারল্যান্ড। সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে তারা 'বেআইনি' আখ্যা দিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের দারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ।

● **সম্পদের মালিকানা নিয়ে বিশ্ব সমীক্ষা :**

আগামী ২০১৬ সালে সারা পৃথিবীর মাত্র ১ শতাংশ মানুষের কাছেই থাকবে বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি ধনসম্পদ। সংখ্যার বিচারে এটি ৩৫০ কোটি মানুষের সম্পত্তির সমান। এই বিরাট বৈষম্যের ছবি ধরা পড়েছে দারিদ্র্যবিরোধী এক আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'অক্সফাম'-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষায়। সমীক্ষা অনুযায়ী, বিশ্বের ৮০ জন বিত্তশালী মানুষ প্রায় ২ লক্ষ কোটি ডলারের বিষয়সম্পত্তির মালিক। এদের মধ্যে ৭০ জনই পুরুষ। এই ৮০ জনের মধ্যে ৩৫ জন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। তাদের মোট সম্পদের পরিমাণ ৯৪,১০০ কোটি ডলার। তালিকায় এরপর রয়েছেন জার্মানি ও রাশিয়ার ধনকুবেররা।

এই দেশ

● **লোকসভায় পেশ করা হল জিএসটি বিল :**

গত ১৯ ডিসেম্বর পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী (১২২তম সংশোধন) বিল পেশ করা হল। সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, জিএসটি চালু হলে কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক, পরিষেবা কর, আমদানি শুল্ক, রাজ্যগুলির যুক্তমূল্য কর (ভ্যাট), পণ্য প্রবেশ কর, বিনোদন কর, বিক্রয় কর প্রভৃতি উঠে গিয়ে একক কর ব্যবস্থা চালু হবে। এর ফলে সমগ্র দেশে পণ্য ও পরিষেবার একটাই পাইকারি দর হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জিএসটি চালু নিয়ে দীর্ঘ সাত বছর ধরে কেন্দ্রের সঙ্গে সহমত হতে পারেনি রাজ্যগুলি। রাজ্যগুলির আশঙ্কা, এই কর ব্যবস্থা চালু হলে তাদের রাজস্ব ক্ষতি হবে।

● **নীতি আয়োগের দায়িত্বে অরবিন্দ পানগাড়িয়া :**

নবগঠিত নীতি আয়োগের প্রথম ভাইসচেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন অর্থনীতিবিদ ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২ বছর বয়সি অধ্যাপক অরবিন্দ পানগাড়িয়া। বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।

● **নতুন গুপ্তচর প্রধান :**

জাতীয় গুপ্তচর সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল উইঙ্গ (RAW)-এর প্রধানের দায়িত্ব পেলেন ওই সংস্থারই বিশেষ সচিব রাজেন্দ্র খান্না। অন্যদিকে আধাসামরিক বাহিনী সেন্ট্রাল রিজার্ভ প্রোটেকশন ফোর্স (CRPF)-এর প্রধান পদে এলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিশেষ সচিব প্রকাশ মিশ্র।

● **ঝাড়খণ্ড ও জম্মু-কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন :**

ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি অল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্ট ইউনিয়নের (আজসু) সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার গঠন করল। ৮১ আসনের বিধানসভায় বিজেপি ৩৭ এবং আজসু ৫ টি আসনে জয়ী হয়েছে। সরকার গঠনের জন্য দরকার ছিল ৪১ টি আসন। অন্যান্যদের মধ্যে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ১৮, জেভিএম ৮, কংগ্রেস ৬ এবং নির্দল ১টি। রঘুবর দাস মুখ্যমন্ত্রী হলেন।

অন্যদিকে ৮৭ আসনবিশিষ্ট জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় কোনও দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। প্রায় এক দশক ধরে ক্ষমতাশীল ন্যাশনাল কনফারেন্স ১৫, বিজেপি ২৫, পিপ্‌লস্ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ২৮ এবং কংগ্রেস ১২টি আসন পেয়েছে। সাতটি আসন ভাগ করে নিয়েছে অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলি।

● **বিমা-কয়লায় 'অধ্যাদেশ' (অর্ডিন্যান্স) :**

বিমা ও কয়লা শিল্পের জন্য গত ১৪ ডিসেম্বর অধ্যাদেশ জারি করল কেন্দ্রীয় সরকার। দুটি ক্ষেত্রেই এই পদক্ষেপকে শিল্পমহলের কাছে সংস্কারের বার্তা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে বিমায় প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির ঊর্ধ্বসীমা ২৬ থেকে বেড়ে ৪৯ শতাংশ হবে। অন্যদিকে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে বাতিল হয়ে যাওয়া কয়লা খনিগুলির ফের নিলামের পথও সুগম হবে।

● **পুলিশবাহিনীতে ৩৩ শতাংশ মহিলা কর্মী :**

পুলিশবাহিনীতে ৩৩ শতাংশ মহিলা নিয়োগের ব্যাপারে প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। উল্লেখ্য, এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীতে কমপক্ষে ১০ লক্ষ জওয়ান রয়েছেন, কিন্তু সেখানে মহিলাদের যোগদান মাত্র ১.৫ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে ২০১৮-র মধ্যে ওই যোগদানকে কমপক্ষে ৫ শতাংশ-এ নিয়ে যেতে।

● **অস্ত্র কেনাবেচায় প্রতিনিধির ভূমিকাকে আইনি স্বীকৃতি :**

বিদেশ থেকে সামরিক সরঞ্জাম কেনাবেচায় মধ্যস্থতাকারী বা প্রতিনিধির ভূমিকাকে কেন্দ্রীয় সরকার আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল। সরকারের যুক্তি, এর ফলে অস্ত্র কেনাবেচায় স্বচ্ছতা আসবে। কারণ, বিদেশি সংস্থাগুলির থেকে যুদ্ধাস্ত্র বা যুদ্ধ সরঞ্জাম কিনতে হলে মধ্যস্থতাকারী বা প্রতিনিধির ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই।

● **বিচারপতি নিয়োগ সংক্রান্ত বিলে অনুমোদন রাষ্ট্রপতির :**

বিচারপতি নিয়োগ সংক্রান্ত ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্টস্ কমিশন (NJAC) বিলে সম্মতি দিলেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। সর্বোচ্চ আদালত এবং দেশের উচ্চ আদালতগুলিতে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষমতার ব্যাপারে গত আগস্টে সংসদে সংশোধনী বিল গৃহীত হয়। সংশোধনী অনুযায়ী, বিচারপতি নিয়োগ এবং বদলির ক্ষেত্রে বিশেষ একটি কমিশন গঠিত হওয়ার কথা। উল্লেখ্য, সংবিধানের এটি ১২৪তম সংশোধন। প্রস্তাবিত কমিশনের নেতৃত্বে থাকছেন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি। এখন কমিশন গঠনে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন মেলার পর থেকে সংশোধনী বিলটি আইনে পরিণত হয়ে গেল।

● **গ্রেড সিস্টেম বাধ্যতামূলক ঘোষণা ইউজিসি-র :**

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই সেমেস্টারভিত্তিক পাঠক্রম ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গ্রেডেশন পদ্ধতি চালু করার নির্দেশ দিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর বৈঠকের পর এ বিষয়ে রাজ্যগুলিকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে বলল ইউজিসি। উল্লেখ্য, দেশের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমেস্টার প্রথা ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যবস্থাকে সর্বজনীন করে তুলতে চায়। সঙ্গে গ্রেডেশন পদ্ধতিও বাধ্যতামূলক করা হবে। ইউজিসি-র মাধ্যমে সেই নির্দেশই জারি হল।

● **'তেজস' পেল ভারতীয় বায়ুসেনা :**

এই প্রথম কম ওজনের যুদ্ধবিমান 'তেজস' এল ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে। ৩২ বছর আগেই প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছিল। এতদিনে (১৭ জানুয়ারি) তা বাস্তবে রূপান্তরিত হল। প্রতিরক্ষা সূত্রের খবর, বেঙ্গালুরুর হিন্দুস্থান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড নামক বিমান প্রস্তুতকারক সংস্থার একটি অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মনোহর পারীকর বায়ুসেনা-প্রধান অরূপ রাহার উপস্থিতিতে বায়ুসেনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই যুদ্ধবিমান হস্তান্তর করেন।

এই রাজ্য

● **ইকো ট্যুরিজম পর্ষদ রাজ্যে :**

রাজ্যে পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে একটি 'ইকো ট্যুরিজম পর্ষদ' গঠন করার কথা ঘোষণা করা হল। রাজ্য পর্যটন মন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে, রাজস্থান-মহারাষ্ট্রের অনুসরণে স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এই রাজ্যেও পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে কীভাবে গড়ে তোলা হয়েছে তার বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, বিশ্বের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১০ শতাংশ আসে পর্যটন ক্ষেত্র থেকে। ভারতে এই হার ৬ শতাংশ। তবে সার্বিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে পর্যটন শিল্পের প্রসার হচ্ছে বলে রাজ্য পর্যটন সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

● **বিরল প্রজাতির টিয়া উদ্ধার :**

নদিয়া জেলার সীমান্তে আটক করা হয় বিরল প্রজাতির টিয়া পাখি। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (BSF) সূত্রে বলা হয়েছে রাস্তায় ফেলে যাওয়া দুটি খাঁচা থেকে প্রায় ৩০টি "আফ্রিকান গ্রে প্যারোট" উদ্ধার করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে এই টিয়াগুলির দর প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা। পাখিগুলিকে বনগাঁ বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

অর্থনীতি

● **অনাদায়ী ঋণ :**

মোট ঋণের সাপেক্ষে অনাদায়ী সম্পদের অনুপাত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইউনাইটেড ব্যাংকে—এই অনুপাত ১০.৭৮ শতাংশ। বেসরকারি ব্যাংকের মধ্যে এই অনুপাত সবচেয়ে বেশি ধনলক্ষ্মী ব্যাংকে (৭.২৭ শতাংশ)। সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রে এই হার হল ৫.২৯ শতাংশ, বেসরকারি ক্ষেত্রে ২.০৫ শতাংশ এবং বিদেশি ব্যাংকের ক্ষেত্রে ৩.৯ শতাংশ। বিজয়া ব্যাংক (২.৮৫ শতাংশ) ও ইয়েস ব্যাংক (০.৩৬ শতাংশ) যথাক্রমে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল পরিস্থিতিতে আছে।

● **কয়লার ই-নিলামের বিজ্ঞপ্তি জারি :**

সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে বাতিল হয়ে যাওয়া কয়লা ব্লকের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ১৩১-টির নিলামের খসড়া বিজ্ঞপ্তি জারি করল কেন্দ্রীয় সরকার। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কয়লা ব্যবহারকারী বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য কয়লাখনি চিহ্নিত করা হবে এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ ই-নিলামের মাধ্যমে তা বণ্টন করা হবে।

● **পিএফ-এর সুদের হার একই থাকছে :**

চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ডে (পিএফ) সুদের হার ৮.৭৫ শতাংশে বেঁধে রাখার কথা জানাল কেন্দ্রীয় সরকার। সুদ না বাড়িয়ে তা গত অর্থবর্ষের হারেই বেঁধে রাখতে গত আগস্টে প্রস্তাব পেশ করেছিল কর্মচারী ভবিষ্যনিধি কর্তৃপক্ষ (EPFO)। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক সেই সুপারিশ মেনে নিল।

● **স্পেকট্রাম নিলামে মন্ত্রীসভার অনুমোদন :**

স্পেকট্রাম নিলামে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। নিলাম হচ্ছে ৩টি ব্যান্ডের মোট ৩৮০.৭৫ মেগাহার্ৎজ টু-জি স্পেকট্রাম। এই নিলাম থেকে সরকার ৬৪,৮৪০ কোটি টাকা পাওয়ার আশা করছে।

● **রেপো রেট কমাল রিজার্ভ ব্যাংক :**

রেপো রেট ০.২৫ শতাংশ (২৫ বেসিস পয়েন্ট) কমিয়ে দিল রিজার্ভ ব্যাংক। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির থেকে ঋণ নেওয়ার খরচ কমবে—ফলে বাড়ি, গাড়ি ও ব্যক্তিগত ঋণের মাসিক কিস্তি কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।

● **মহিলা ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধি :**

আগামী মাসের (মার্চ) মধ্যেই সারা দেশে ভারতীয় মহিলা ব্যাংকের (বিএমবি) শাখার সংখ্যা ৮০-তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে ২০টি হবে গ্রামাঞ্চলে। ১২ জানুয়ারি ভোপালে ব্যাংকের নতুন একটি শাখা উদ্‌বোধন করে এ কথা জানান বিএমবি-র চেয়ারপার্সন

ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঊষা অনন্তসুব্রহ্মণ্যম্। ২০১৩ সালে চালু হওয়ার পর এ পর্যন্ত দেশে মহিলা ব্যাংকের শাখা দাঁড়াল ৩৯।

বিজ্ঞান বিচিত্রা

● **মহাকাশ গবেষণায় বিরাট সাফল্য 'ইসরো'-র :**

সবচেয়ে ক্ষমতাশালী উপগ্রহ-উৎক্ষেপণযানের পরীক্ষামূলক ব্যবহারে সফল হলেন ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ইসরো'-র বিজ্ঞানীরা। এতদিন পর্যন্ত কম ওজনের উপগ্রহ সহজেই কক্ষপথে পৌঁছে দেওয়ার মতো উৎক্ষেপণযান তাঁদের হাতে ছিল। কিন্তু 'জিএসএলভি' মার্ক-৩ যানটি পুরোপুরি কার্যকর হলে প্রায় চার টন ভারী উপগ্রহ কক্ষপথে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে বলে ইসরোর বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথম চেষ্টাতেই মঙ্গলযানের সফল উৎক্ষেপণ ঘটিয়ে মহাকাশ গবেষণায় ভারত অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে।

● **প্রাক্-জুরাসিক যুগের জীবাশ্মের সন্ধান ব্রিটেনে :**

সম্প্রতি ব্রিটেনের ওয়েলসের দক্ষিণে সমুদ্রসৈকতে ৬০ কিলোগ্রাম ওজনের একটি জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রথমে মনে করা হয়েছিল যে, খুঁজে পাওয়া বস্তুটি একটি পাথরের চাঁই। কিন্তু জীববিজ্ঞানীদের তৎপরতায় জানা যায় যে, এটি পাথর নয়, আসলে একটি জীবাশ্ম। জুরাসিক যুগেরও আগে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াত মাছ ও সরীসৃপের মাঝামাঝি অবস্থার জীব "ইকথিওসর্স"। প্রায় পঁচিশ কোটি বছর আগে ওই জীব পৃথিবীর বুকে বিচরণ করত। অর্থাৎ ডাইনোসর-এর আবির্ভাবেরও অন্তত আড়াই কোটি বছর আগে।

● **হরপ্পা সভ্যতার বাড়ির চিহ্ন উত্তরপ্রদেশে :**

সাম্প্রতিক অনুসন্ধান বলছে, বাস্তবে হরপ্পা সভ্যতার বিস্তার হয়েছিল উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত। এবার উত্তরপ্রদেশের বাগপত জেলায় মিলেছে এক বাড়ির ধ্বংসাবশেষ—সেটি আদপে হরপ্পা সভ্যতার শেষ নিদর্শন বলে দাবি করলেন ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থা এএসআই-এর গবেষকেরা।

● **গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে :**

ওয়াশিংটনের চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের একটি দল সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় জানিয়েছেন, গত বছর (২০১৪) যে শিশু জন্মেছে সে ১৯৯০-এর দশকে যারা জন্মেছে, তাদের থেকে অন্তত ছ-বছর বেশি আয়ু পাবে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতি ও পরিকাঠামোগত উন্নতির ফলে বিশ্বের ধনী দেশগুলি তো বটেই, এমনকি দরিদ্র দেশগুলির বাসিন্দাদেরও আয়ু অনেকটা বেড়ে গেছে। এর মধ্যে আফ্রিকার কয়েকটি দেশ এবং নেপালের ক্ষেত্রে গড় আয়ু ১২ বছর পর্যন্ত বেড়েছে। উল্লেখ্য, সারা বিশ্বে মানুষের বর্তমান গড় আয়ু ৭০ বছর।

● **আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে ১৬ বার বর্ষবরণ উৎসব :**

পৃথিবীবাসীরা যে উৎসব পালন করলেন একবার, সেই বর্ষবরণ উৎসব সারা দিনে ১৬ বার পালন করলেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের মহাকাশচারীর দল। ঘণ্টায় ২৮ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি বেগে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকা ওই মহাকাশযান ২৪ ঘণ্টায় ১৬ বার সূর্য উঠতে এবং অস্ত যেতে দেখল।

● **মিশরের রানির সমাধির সন্ধান :**

মিশরের আল-সির অঞ্চলে রাজপরিবারের জন্য নির্দিষ্ট সমাধিক্ষেত্র থেকে আবিষ্কার করা হল রানি তৃতীয় খেনতাকাউইস-এর সমাধি। আর সবচেয়ে বিস্ময়ের ঘটনা হল, এই সমাধির সন্ধান পাওয়ার আগে পর্যন্ত মিশরবিদরা জানতেনই না, প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগের এই রানির অস্তিত্ব। যাই হোক, মিশরের পুরাতত্ত্ববিদেরা জানান, এর আগে একই নামধারী আরও দুই রানির কথা জানা ছিল আধুনিক দুনিয়ার। তাই সদ্য খুঁজে পাওয়া এই পঞ্চম বংশীয় রানিকে 'তৃতীয়' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

● **রান্না শিখছে রোবট :**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী-গবেষকেরা যন্ত্রমানবদের (রোবট) রান্না শেখাচ্ছেন বলে সংবাদ সংস্থা সূত্রে প্রকাশ। বলা হয়েছে, এর জন্য 'টিউটোরিয়াল' হিসেবে বেছে নিয়েছেন ইউটিউবকে। এখানে পোস্ট করা ৮৮টি ভিডিয়ো থেকে তথ্য সংগ্রহ করে যান্ত্রিক মানুষদের মগজে তথ্য ভরা হচ্ছে। পর্দার ছবি দেখে সেই ছবি অনুযায়ী প্রোগ্রামিং কম্যান্ড তৈরি করতে যথেষ্ট সুবিধা হচ্ছে বলে বিজ্ঞানীদের দাবি।

● **আরও আটটি গ্রহের সন্ধান :**

মহাকাশের দূর প্রান্তে পৃথিবীর মতোই আরও আটটি গ্রহের সন্ধান পেলেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। ওই গ্রহগুলির মধ্যে একটির আবহাওয়া পৃথিবীরই মতো। প্রসঙ্গত এই নিয়ে এ পর্যন্ত প্রায় এক হাজার গ্রহের সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা।

● **ডাইনোসরদের 'স্বর্গরাজ্য' ছিল ইউরোপ :**

ব্রিটিশ প্রাণীবিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক ঘোষণা, আজ থেকে সাড়ে ৬ কোটি বছর আগে আজকের ইউরোপই ছিল ডাইনোসরদের 'স্বর্গরাজ্য'। গ্রহাণুর ধাক্কায় পৃথিবী থেকে ডাইনোসররা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আগে বিভিন্ন প্রজাতির ডাইনোসর বিচরণ করে বেড়াত ইউরোপে। মহাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে বিপুল পরিমাণে ডাইনোসর ও তাদের ডিমের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, তাতেই এমন সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানীদের।

● **'প্লুটো'-র ওপারে আরও গ্রহ :**

'প্লুটো'-তেই শেষ নয়, 'প্লুটো'-র ওপারে অন্তত আরও দুটি গ্রহ রয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। তাঁদের মতে, 'নেপচুন' ও 'প্লুটো'-র মাঝখানে থাকা মহাজাগতিক বস্তুগুলির 'বিচিত্র' গতিপ্রকৃতির ব্যাখ্যা দিতে পারে একমাত্র এই দুটি গ্রহই।

● **'অ্যালজাইমার' নিরাময়ে হলুদ :**

'অ্যালজাইমার' রোগ সারানোর সম্ভাবনা হলুদের মধ্যে লুকিয়ে আছে বলে দাবি করলেন বিজ্ঞানীদের একটি দল। তাঁদের মতে, প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পাওয়া হলুদের মধ্যে 'কারকিউমিন' নামে এক

ধরনের রাসায়নিক আছে। সেই রাসায়নিকের মধ্যে মস্তিষ্কের সমস্যা দূর করার ক্ষমতা রয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের দাবি। এ নিয়ে আপাতত বিশদ গবেষণা চলছে।

● **রোগ প্রতিরোধে পরিবেশ :**

রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য এতদিন জিনকেই কৃতিত্ব দিতেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু এবার সেই ধারণা বদলে দিয়ে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, জিন নয়, রোগ প্রতিরোধে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নেয় পরিবেশ। বেশ কয়েক জোড়া যমজ সন্তানের ওপর ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন তাঁরা।

খেলার জগৎ

● **নেতৃত্ব বদল ইংল্যান্ডের একদিনের ক্রিকেটে :**

ইংল্যান্ডের একদিনের ক্রিকেট দলের অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল অ্যালিস্টার কুক্-কে। তাঁর জায়গায় ইয়ান মর্গানকে নিয়ে আসা হল। আসন্ন ত্রিদেশীয় একদিনের আন্তর্জাতিকে (ভারত-অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড) মর্গান-ই ইংল্যান্ড দলের নেতৃত্ব দেবেন এবং বিশ্বকাপেও মর্গান-ই ইংল্যান্ডের অধিনায়কত্ব করবেন বলে ইংল্যান্ডে ক্রিকেট নিয়ামক সূত্রে জানানো হয়েছে।

● **আইএসএল ফুটবল খেতাব কলকাতার :**

আট কোটি টাকা পুরস্কার মূল্যের ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (ISL) ফুটবল খেতাব জিতল অ্যাটলেটিকো ডি কলকাতা। মুম্বই-এ ডি ওয়াই প্যাটেল স্টেডিয়ামে এক উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনালে কলকাতা ১-০ গোলে হারাল কেরল ব্লাস্টার্সকে। খেলার অন্তিম মুহূর্তে অ্যাটলেটিকোর পক্ষে জয়সূচক গোলটি করেন মহম্মদ রফিক। প্রসঙ্গত কলকাতা এবং কেরল দলের অন্যতম টিম মালিক যথাক্রমে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও শচীন তেণ্ডুলকর।

● **দুবাই ওপেন গল্‌ফ খেতাব অর্জুন অটওয়ালের :**

দীর্ঘদিনের খরা কাটিয়ে অবশেষে দুবাই ওপেন গল্‌ফে চ্যাম্পিয়ন হলেন কলকাতার অর্জুন অটওয়াল। পুরস্কার মূল্য হিসেবে পেলেন ৯০ হাজার ডলার।

● **হোল্ডারকে অধিনায়ক বেছে নেওয়া হল :**

ওয়েস্ট ইন্ডিজের একদিনের ক্রিকেট টিমে নতুন অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন ২৩ বছর বয়সি জেসন হোল্ডার। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই অপেক্ষাকৃত তরুণ খেলোয়াড়কে দলের অধিনায়ক পদে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে নির্বাচক কমিটির চেরায়ম্যান ক্লাইভ লয়েড জানিয়েছেন।

● **জুনিয়র জাতীয় ব্যাডমিন্টন খেতাব বজায় ঋতুপর্ণা দাসের :**

এবারও জুনিয়র জাতীয় ব্যাডমিন্টনের সিঙ্গল্‌স খেতাব জিতলেন বাংলার ঋতুপর্ণা দাস। অনূর্ধ্ব উনিশ (১৯) বিভাগের ফাইনালে ঋতুপর্ণা একুশ-উনিশ, একুশ-উনিশ পয়েন্টে হারান তেলেঙ্গানার রুথভিকা শিবানীকে। এর পাশাপাশি রুথভিকা শিবানীর সঙ্গেই জুটি বেঁধে মেয়েদের অনূর্ধ্ব উনিশ ডাবল্‌স ট্রফিও জিতে নেন তিনি।

● **বন্ধ হয়ে গেল আফগানিস্তান মহিলা ক্রিকেট :**

তালিবান জঙ্গিদের চোখরাঙানিতে বন্ধ হয়ে গেল আফগানিস্তানের মহিলা ক্রিকেট। গত ২০১০ সালে সন্ত্রাসদীর্ণ আফগান ভূখণ্ডে চালু হয়েছিল মহিলা ক্রিকেট। শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই তুমুল জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু চার বছরের মাথায় ফের তা বন্ধ হয়ে গেল। তালিবান নেতৃত্ব এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়ে দেয় যে, মহিলাদের ক্রিকেট অপ্রয়োজনীয়।

● **চ্যাম্পিয়ন শঙ্কর দাস :**

যে ক্লাবে একসময় 'বলবয়' ছিলেন, সেই রয়্যাল ক্যালকাটা গল্‌ফ ক্লাবে পি জি টি আইয়ের বর্ষশেষ গল্‌ফ মিট ম্যাকলিয়ড-রাসেল ট্যুরে চ্যাম্পিয়ন হলেন বাংলার শঙ্কর দাস। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে অর্জুন অটওয়াল, গগনজিৎ ভুল্লার, এসএসপি চৌরাসিয়ার মতো তারকা গল্‌ফারদের হারালেন তিনি।

● **অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবলে ভারতের কোচ অ্যাডম :**

জার্মান কোচ নিকোলাই অ্যাডম ২০১৭ সালে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবলে ভারতের কোচ হচ্ছেন। এ ব্যাপারে ভারতীয় ফুটবল নিয়ামক সংস্থা (AIFF) চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে জাতীয় ফুটবল দলের কোচ হিসেবে পুরোনো মুখ স্টিফেন কনস্ট্যান্টাইন-এর ভারতে আসা প্রায় নিশ্চিত বলে AIFF জানিয়েছে।

● **বিদেশে সিরিজ হারার ধারা অব্যাহত ভারতের :**

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চার টেস্টের সিরিজ ০-২-এ হেরে গেল ভারত। অ্যাডিলেডে প্রথম টেস্টে ভারতকে ৪৮ রানে, ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্টে ৪ উইকেটে হারিয়ে ২-০-তে এগিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। এরপর মেলবোর্নে তৃতীয় এবং সিডনিতে চতুর্থ তথা শেষ টেস্ট হারতে হারতে ড্র করে ভারত। এই ক্রিকেট সিরিজে সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা হল, মেলবোর্ন টেস্টের পরেই ভারতের অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির টেস্ট ক্রিকেট থেকে আচমকা অবসর। ধোনির জায়গায় বিরাট কোহ্‌লিকে অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়। গত জুন-জুলাইয়ে ইংল্যান্ড সফরে চূড়ন্ত ব্যর্থ কোহ্‌লি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মোট ৪টি শতরান করেন। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে স্টিভেন স্মিথ (দ্বিতীয় টেস্ট থেকে মাইকেল ক্লার্কের বদলে অধিনায়ক হন) চার টেস্টে ৪টি শতরানসহ মোট ৭৫৯ রান করে ভারতের বিরুদ্ধে ডন ব্র্যাডম্যানের সর্বোচ্চ রানের (৩ টেস্টে ৭০৫) রেকর্ড ভেঙে দেন।

● **ফেডারেশন কাপ ফুটবল খেতাব বেঙ্গালুরুর :**

গোয়ার মাঠে ডেম্পো স্পোর্টস্ ক্লাবকে ২-১ গোলে হারিয়ে প্রথম বার ফেডারেশন কাপ ফুটবল খেতাব জিতল বেঙ্গালুরু এফ সি। বিজয়ী দলের হয়ে গোল করেন সুনীল ছেত্রী ও রবিন সিং। ডেম্পো-র হয়ে গোল করেন টোলগে ওজবে।

● **জাতীয় টেব্‌ল টেনিস :**

পুদুচেরি-তে আয়োজিত জাতীয় টেব্‌ল টেনিস প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল পেট্রোলিয়াম স্পোর্টস্ বোর্ড। পুরুষ ও মহিলা, দু-

বিভাগের ফাইনালে তারা হারাল বাংলার দলকে। পেট্রোলিয়াম স্পোর্টস্ বোর্ড দলে রয়েছেন বাংলারই তারকা সৌমজিৎ ঘোষ, পৌলমী ঘটক, মৌমা দাস, অঙ্কিতা দাস প্রমুখ। বাংলা দলের প্রতিনিধিত্ব করেন সৌগত সরকার, সৌরভ সাহা, অনিন্দিতা চক্রবর্তী, পল্লবী কুণ্ডু প্রমুখ। অন্যদিকে, ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষ ও মহিলাদের খেতাব জিতলেন সৌমজিৎ ঘোষ ও মৌমা দাস। মৌমা এই নিয়ে পাঁচ বার জাতীয় খেতাব জিতলেন।

● **একদিনের ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরি :**

জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারার্সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একদিনের ক্রিকেট সিরিজের প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার এবি ডিভিলিয়ার্স ৩১ বলে শতরান করে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন। এর আগে নিউজিল্যান্ডের কোরি অ্যান্ডারসনের দখলে ছিল বিশ্বরেকর্ড। ২০১৩ সালে অ্যান্ডারসন এই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধেই ৩৬ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন। ডিভিলিয়ার্স শেষ পর্যন্ত ৪৪ বলে ১৪৯ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা করে ৪৩৯-২ (৫০ ওভারে)। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ করে ২৯১ (৫০ ওভারে)।

● **বিলিয়ার্ডসে জোড়া খেতাব দোয়েল দে-র :**

জাতীয় বিলিয়ার্ডসে জুনিয়র ও সাবজুনিয়ার খেতাব জিতে ইতিহাস গড়লেন বাংলার দোয়েল দে (১৬)। বিলিয়ার্ডসে বাংলার মেয়েদের মধ্যে তিনি নতুন নজির গড়লেন।

বিবিধ সংবাদ

● **হৃদ্‌যন্ত্র দ্রুত পৌঁছে দিল গ্রিন করিডর :**

দক্ষিণ দিল্লির একটি বেসরকারি হাসাপাতালে দুরারোগ্য হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত এক কিশোরের হৃৎপিণ্ড সাফল্যের সঙ্গে প্রতিস্থাপন করা হল। গুরগাঁও-এর একটি হাসপাতলে এক তরুণের মস্তিষ্কের মৃত্যু ঘোষণার পর তার হৃৎপিণ্ডটি অন্যের দেহে প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঠিক হয় গুরগাঁও থেকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হবে হৃৎপিণ্ডটি। পুলিশের সহায়তায় গ্রিন করিডর দিয়ে মাত্র একুশ মিনিটে ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত দিল্লির হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া হয় হৃৎপিণ্ডটি এবং সাফল্যের সঙ্গে সেটি প্রতিস্থাপন করা হয়।

● **মার্কিন সার্জন-জেনারেল হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত :**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদে আসীন হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিবেক হ্যালেগের মূর্তি। তিনি ১৯তম মার্কিন সার্জন-জেনারেল হলেন। মাত্র ৩৭ বছর বয়সে এই গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব নিয়ে এক নতুন নজির গড়লেন ডা. মূর্তি। ডা. মূর্তির নির্বাচনের পিছনে জনস্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাই সবচেয়ে বড় নির্ণায়ক হয়েছে বলে মার্কিন সেনেটাররা জানিয়েছেন।

● **মার্কিন সেনেটে সম্মানিত মালালা ও সত্যার্থী :**

শিশু অধিকারের জন্য অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিতে কৈলাস সত্যার্থী এবং মালালা ইউসুফজাইকে কুর্নিশ জানাল মর্কিন সেনেট। শান্তিতে নোবেলজয়ী এই দুজনের সংগ্রামকে স্মরণে রেখে মার্কিন সেনেট তাঁদের 'শান্তির প্রতীক' আখ্যা দিয়েছে। গত ১৮ ডিসেম্বর এই মর্মে মার্কিন সেনেটে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এটি এক বিরল সম্মান।

● **নিলামে চার্চিলের ছবি :**

লন্ডনের সদ্‌বির নিলামে বিক্রি হয়ে গেল ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উইন্‌স্টন চার্চিলের আঁকা ১৫-টি ছবি। এর আগে কখনও একসঙ্গে চার্চিলের আঁকা এতগুলো ছবি বিক্রি হয়নি। সংবাদে প্রকাশ, চার্চিলকন্যা মেরি সোয়ামেস-এর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে এই ছবিগুলি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বেস কয়েকটি ছবি চার্চিল এঁকেছিলেন ফ্রান্সে বসে।

● **সাত মহাদেশের সাত শৃঙ্গ জয় যমজ বোনের :**

সাতটি মহাদেশের সাতটি উচ্চতম শৃঙ্গ জয় করে অনন্যসাধারণ নজির গড়লেন দেরাদুনের যমজ বোন ২৩ বছরের তাশি মালিক ও নাঙ্গশি মালিক। ২০১২ সালের আফ্রিকার মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো দিয়ে শুরু। তারপর একে একে মাউন্ট এভারেস্ট (এশিয়া), মাউন্ট এলব্রুস (ইউরোপ), মাউন্ট অ্যাকাংকাগুয়া (দক্ষিণ আমেরিকা), মাউন্ট কারস্টেনংজ পিরামিড (ওশেনিয়া), মাউন্ট ম্যাকিনলে (উত্তর আমেরিকা) এবং মাউন্ট ভিনসন (অ্যান্টার্কটিকা)।

● **'ভারতরত্ন' বাজপেয়ী ও মালব্যকে :**

দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'ভারতরত্ন'-এ ভূষিত করা হল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী ও মদনমোহন মালব্য-কে (মরণোত্তর)।

● **তৃতীয় লিঙ্গের জয় :**

ছত্তিশগড়ের রায়গড় পুরসভা মেয়রের নির্বাচনে জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন এক রূপান্তরকামী মধু কিন্নর। নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি ৪,৫৩৭ ভোটে হারান বিজেপি প্রার্থী মহাবীর গুরুজিকে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন দলিত সম্প্রদায়ের মধু কিন্নর। একসময়ে ট্রেনে নাচগান করে পয়সা উপার্জন করতেন তিনি।

● **কত্থক শিল্পী প্রয়াত :**

কত্থক নৃত্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ শিল্পী পণ্ডিত চিত্রেশ দাস (৭০) প্রয়াত হলেন। মার্কিন প্রবাসী এই শিল্পী সানফ্রানসিস্‌কো সহ একাধিক শহরে কত্থক নৃত্যকে ছড়িয়ে দিতে আজীবন পরিশ্রম করেছেন।

● **অক্সফোর্ড অভিধানে নতুন ভারতীয় শব্দ :**

অক্সফোর্ড অভিধানের নবম সংস্করণে মোট ২৪০টি নতুন 'ভারতীয় ইংরেজি' শব্দ জায়গা করে নিল। উল্লেখ্য, অক্সফোর্ড অভিধান 'বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য অভিধান' বলে স্বীকৃত। 'বুথ ক্যাপচারিং' ছাড়া অক্সফোর্ড অভিধানে স্থান পেয়েছে 'পাঁপড়', 'কিমা', 'কারিলিফ'-এর মতো শব্দও।□

সংকলক : দেবাংশু দাশগুপ্ত

জা নে ন কি?

ফসল বিমা

মলয় ঘোষ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পোকা ও রোগের আক্রমণে বিজ্ঞাপিত ফসলে কোনও একটি চাষ করা না গেলে বা ফসল নষ্ট হলে কৃষকদের বিমার সুবিধা ও আর্থিক সহায়তার সংস্থান রয়েছে রাষ্ট্রীয় ফসল বিমা কার্যক্রম-এ (RFBK) বা নামান্তরে ন্যাশনাল ক্রপ ইনশিয়োরেন্স প্রোগ্রাম-এ (NCIP)। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্যই হল কৃষকদের প্রগতিশীল কৃষি পদ্ধতি, উচ্চমানের বীজ ও সারের ব্যবহার, উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে সড়োগড়ো হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা এবং কৃষিজ আয় স্থিতিশীল করতে বিশেষ করে বিপর্যয়ের বছরগুলিতে সাহায্য করা। এগ্রিকালচার ইনশিয়োরেন্স কোম্পানি অব ইন্ডিয়া লিমিটেড ছাড়াও কৃষি ও সমবায় দপ্তরের নির্ধারিত তালিকা থেকে রূপায়ণকারী রাজ্যগুলি এই কার্যক্রম রূপায়ণ করতে পছন্দ-মাফিক উপযুক্ত পরিকাঠামো ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন বেসরকারি বিমা সংস্থাকে অনুমতি দিতে পারে।

বিমার আওতায় কারা

খাদ্যশস্য, তৈলবীজ এবং বার্ষিক বাণিজ্যিক বা উদ্যান সংক্রান্ত শস্য রাষ্ট্রীয় বিমা কার্যক্রমের অধীনে আছে। যে কৃষকেরা ঋণ নিয়েছেন তাঁদেরকে বাধ্যতামূলক অংশের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং যে কৃষকেরা ঋণ নেননি তাঁদেরকে স্বেচ্ছামূলক অংশের আওতায় ধরা হয়েছে। ন্যাশনাল ক্রপ ইনশিয়োরেন্স প্রোগ্রাম-এর সর্বাঙ্গীণ অংশ হিসেবে সারা দেশে সংশোধিত রাষ্ট্রীয় কৃষি বিমা স্কিম বা মডিফায়েড ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল ইনশিয়োরেন্স স্কিম (MNAIS) রূপায়িত করার কথা বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিজ্ঞাপিত ফসল উৎপাদনকারী ভাগচাষি সহ সব ধরনের কৃষকেরা এই বিমার আওতায় আসবে।

ঝুঁকি ও ছাড়

চাষের ক্ষেত্রে বীজ বপন থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত কৃষকদের স্বাভাবিক ঝুঁকি বিমা প্রদান করা হয়। দাবানল, বজ্রপাত, ঝড়, শিলাবৃষ্টি, বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, প্লাবন, খরা, শুষ্ক মরশুম, রোগপোকার ক্ষতি প্রভৃতি নানারকম ঝুঁকির জন্য ফসলের ক্ষতি হলে কৃষক এই বিমার আওতায় আসবেন। অনেক সময় দেখা যায় কোনও একটি অঞ্চলে বৃষ্টির অভাবে অথবা মরশুমি আবহাওয়ার বিরূপতার কারণে কৃষক চাষ করতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন। সেক্ষেত্রে বিমাকৃত কৃষক, যাঁর পুরোদমে চাষের ইচ্ছে রয়েছে এবং তার জন্য কিছু খরচও করেছেন অথচ রোপণ-বপনে ব্যর্থ হয়েছেন, তিনি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। এক্ষেত্রে বিমাকৃত রাশির সর্বাধিক ২৫ শতাংশ ক্ষতিপূরণ বাবদ দেওয়া হয়। বিভিন্ন ধরনের শস্যের ক্ষেত্রে কী ধরনের অর্থ দেওয়া হবে তা রূপায়ণকারী সংস্থাকে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করতে হয়। ফসল কাটার পর কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিমার সুযোগ থাকে। যেমন—ফসল কাটার পর দু-সপ্তাহের মধ্যে মাঠে শুকানোর সময় ঘূর্ণিঝড়ের ফলে নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় কিছু কিছু বিচার্য বিষয় ধরে। যুদ্ধ বা পরমাণু ঝুঁকির মতো ক্ষেত্রে কৃষক বিমার আওতায় আসবেন।

বিমা রাশি

বাধ্যতামূলক অংশে ঋণগ্রহীতা কৃষকদের ক্ষেত্রে বিমা রাশি হতে হবে অন্তত শস্য ঋণ বরাদ্দ/প্রাপ্ত অগ্রিম মূল্যের সমপরিমাণ, যা বিমাকৃত কৃষক ইচ্ছা করলে বিমাকৃত শস্যের ন্যূনতম ফসলের মূল্য পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। যেখানে ন্যূনতম ফসলের মূল্য প্রতি ইউনিট ঋণের পরিমাণের থেকে কম, সেখানে দুটির মধ্যে যেটি বেশি, সেটি বিমা মূল্য হিসেবে বিবেচিত হবে। ন্যাশনাল থ্রেশোল্ড ইল্ড-এর সঙ্গে চলতি বছরের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য গুণ করলে ন্যূনতম ফসলের মূল্য পাওয়া যায়। যেখানে চলতি বছরের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পাওয়া যাবে না সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিতে হবে। যে শস্যের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করা হয়নি সেখানে বিপণন পর্ষদের ক্রয়মূল্য গ্রহণ করতে হবে।

এ ছাড়া ঋণগ্রহীতা কৃষকদের ক্ষেত্রে কৃষকদের দেয় বিমা মাশুল দেবে ব্যাংক। এই মাশুল পরিগণিত হবে ঋণ পাওয়ার জন্য অর্থের মাপকাঠির অতিরিক্ত অংশ হিসেবে। যে সমস্ত কৃষক স্বেচ্ছায় বিমার আওতায় আসবেন সেক্ষেত্রে বিমাকৃত শস্যের ন্যূনতম ফসলের মূল্য পর্যন্ত বিমা রাশি হবে। যদি কৃষক চান তাহলে তা আরও অধিক পরিমাণে ঝুঁকির আওতায় আনা যাবে। প্রতিটি শস্য মরশুমের আগে ভারত সরকার অনুমোদিত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিটি বিজ্ঞাপিত শস্যের জন্য বিমা সংস্থাগুলি প্রিমিয়ামের পাশাপাশি নেট প্রিমিয়াম রেট (প্রিমিয়াম ভরতুকির পর যে প্রিমিয়াম কৃষকের দেয় হয়) নির্ধারণ করবে। কৃষকদের যে প্রিমিয়াম দিতে হবে তাতে ভরতুকি দেওয়া হয় নিম্নলিখিত উপায়ে (সারণি-১)।

প্রিমিয়ামের হার ১১ শতাংশ ও ৯ শতাংশে সীমিত থাকবে যথাক্রমে খরিফ ও রবি মরশুমে খাদ্য ও তৈলবীজের জন্য।

বার্ষিক বাণিজ্যিক বা উদ্যান সংক্রান্ত শস্যের জন্য এই হার ১৩ শতাংশ করার কথা চলছে।

বিমার ইউনিট

সর্বাত্মক বিপর্যয়ের জন্য বিজ্ঞাপিত শস্যের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার ভিত্তিতে কার্যক্রম রূপায়ণ করার কথা। প্রধান শস্যের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট এলাকা (বিমার ইউনিট এলাকা) গ্রাম বা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর যে নামেই ডাকা হোক না কেন, অন্য শস্যের ক্ষেত্রে রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সিদ্ধান্ত মতো গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে তালুকের পরিমাণগত ইউনিটকেই বোঝাবে। আবার স্থানীয় ঝুঁকির ক্ষেত্রে, অর্থাৎ শিলাবৃষ্টি, ধস প্রভৃতি ক্ষেত্রে দাবি সবসময়ই হবে বিষয়ভিত্তিক।

ঋণগ্রহীতা কৃষক এবং অন্য কৃষকদের জন্য সর্বাত্মক মরশুমি নিয়মগুলি সারণি-২-এর মাধ্যমে উল্লেখ করা হল।

খরিফ শস্যের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত দিন এমনভাবে স্থির করা হয়, যাতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আসার দিনগুলির সঙ্গে খাপ খায়।

এ ছাড়া, তিন ফসলি মরশুমের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত সার্বিক মরশুমি নিয়মকে মাথায় রেখে একটি পরিবর্তিত নিয়ম গ্রহণ করবে শস্য বিমা সংক্রান্ত রাজ্য স্তরীয় সমন্বয় কমিটি বা স্টেট লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি অন ক্রপ ইনশিয়োরেন্স (SLCCCI)।

স্বেচ্ছায় বিমার আওতায় আসা কৃষকরা মরশুমের জন্য অগ্রিম শস্য পরিকল্পনার ভিত্তিতে রোপণ/বপনের আগে বিমা করতে পারেন। কোনও কারণে বিমা করার সময়ের পরিকল্পনা থেকে সরে এসে কৃষক যদি অন্য শস্য চাষ করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে বিমা প্রস্তাব যে আর্থিক সংস্থাকে জমা দেওয়া আছে, তাকে চূড়ান্ত তারিখের ৩০ দিনের মধ্যে পরিবর্তনের কথা জানাতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে গ্রাম স্তরে রাজ্যের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের রোপণ সংক্রান্ত শংসাপত্র। প্রয়োজনে, প্রিমিয়াম পাঠানো অনুযায়ী কৃষক প্রিমিয়ামে অতিরিক্ত দেয়টি মিটিয়ে দেবেন অথবা রূপায়ণকারী সংস্থা অতিরিক্ত অর্থ তাকে ফিরিয়ে দেবে।

সারণি-১
কৃষকের প্রিমিয়ামে ভরতুকির অঙ্ক

ক্রমিক নং	প্রিমিয়াম স্তর	সমভাবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দেয় ভরতুকি (৫০ : ৫০) এবং কৃষককে যে প্রিমিয়াম দিতে হবে
১	২ শতাংশ পর্যন্ত	শূন্য
২	> ২ শতাংশ-৫ শতাংশ	ন্যূনতম নেট প্রিমিয়াম ২ শতাংশ পর্যন্ত হলে ৪০ শতাংশ
৩	> ৫-১০ শতাংশ	ন্যূনতম নেট প্রিমিয়াম ৩ শতাংশ পর্যন্ত হলে ৫০ শতাংশ
৪	> ১০-১৫ শতাংশ	ন্যূনতম নেট প্রিমিয়াম ৫ শতাংশ পর্যন্ত হলে ৬০ শতাংশ
৫	> ১৫ শতাংশ	ন্যূনতম নেট প্রিমিয়াম ৬ শতাংশ পর্যন্ত হলে ৭৫ শতাংশ

সারণি-২
ঋণগ্রহীতা কৃষক এবং অন্য কৃষকদের জন্য সর্বাত্মক মরশুমি নিয়ম

কার্যকলাপ	খরিফ	রবি
ঋণের সময় (বরাদ্দ ঋণ) বাধ্যতামূলক ভিত্তিতে ঋণগ্রহীতা কৃষকদের জন্য	এপ্রিল থেকে জুন/ জুলাই	অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর
স্বেচ্ছাভিত্তিক কৃষকদের প্রস্তাব পাওয়ার শেষ দিন	৩০ জুন/৩১ জুলাই	৩১ ডিসেম্বর
বাধ্যতামূলক ভিত্তিতে ঋণগ্রহীতা কৃষকদের কাছ থেকে ঘোষণাপত্র নেওয়ার ব্যাংকের শেষ দিন	৩১ জুলাই	৩১ জানুয়ারি
স্বেচ্ছা ভিত্তিতে ঋণগ্রহীতা কৃষকদের ব্যাংকের কাছে ঘোষণাপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন	৩১ জুলাই	৩১ জানুয়ারি
উৎপাদিত ফসলের হিসাব জমা দেওয়ার শেষ দিন	ফসল তোলার ১ মাসের মধ্যে	ফসল তোলার ১ মাসের মধ্যে

সারণি-৩
ঐতিহাসিকভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম মরশুমের আবির্ভাব কাল এবং খরিফের জন্য চূড়ান্ত দিন

ক্রমিক নং	রাজ্য	দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আসার সময়	চূড়ান্ত দিন
১	কেরল, তামিলনাড়ু	জুনের প্রথম সপ্তাহ	১৫ জুন
২	অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি	১৫ জুন	৩০ জুন
৩	মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, বিহার	জুনের তৃতীয় সপ্তাহ	৩০ জুন
৪	গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হিমাচলপ্রদেশ	জুনের চতুর্থ সপ্তাহ	৩০ জুন
৫	রাজস্থান, পঞ্জাব, হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীর	জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ	১৫ জুলাই

তদারকি এবং মূল্যায়ন

এই কার্যক্রম জেলা, রাজ্য ও দেশীয় স্তরে নিবিড়ভাবে তদারকি করবে রাজ্য সরকার, রূপায়ণকারী সংস্থা এবং ভারত সরকার। তদারকির জন্য রূপায়ণকারী সংস্থার পাশাপাশি শস্য বিমা সংক্রান্ত রাজ্য স্তরের রাজ্য স্তরীয় সমন্বয় কমিটি দায়িত্বে থাকবে। জাতীয় স্তরে তদারকির জন্য যুগ্ম সচিব (ঋণ)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গড়া যেতে পারে। মূল্যায়নকে মনে করা হয় কার্যক্রম তৈরি ও রূপায়ণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা কর্মসূচির অগ্রগতি ও প্রভাব নির্ধারণের জন্য এবং সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণের বিশ্লেষণের জন্য জরুরি। এটা মাথায় রেখে প্রতি মেয়াদি পরিকল্পনার শেষে সংশোধিত রাষ্ট্রীয় এগ্রিকালচারাল ইনশিয়োরেন্স স্কিম-এর একটি নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করা যেতে পারে।❑

স্বাস্থ্যপরিষেবা ক্ষেত্রে নতুন পেশা

মহুয়া গিরি

কিছুদিন আগেও সাধারণ মানুষ চিকিৎসাক্ষেত্রে যুক্ত পেশাদার বলতে বুঝত ডাক্তার, নার্স ও বড়জোর স্বাস্থ্যকর্মীদের। সময় বদলেছে, সমাজ বদলেছে, বদলেছে কাজের ক্ষেত্র। আজকের দিনে শিক্ষাক্ষেত্রের মতোই স্বাস্থ্যক্ষেত্রও একটি পরিষেবাক্ষেত্র। অর্থাৎ পরিষেবার গুণগত মান, উপভোক্তাদের সন্তুষ্টি, চিকিৎসার খরচ ও পরিবর্তে দেয় পরিষেবা—সবটাই গুরুত্বপূর্ণ। তাই স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এখন কাজের সুযোগ বাড়ছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে রোজই কিছু না কিছু নতুন সমস্যা আসে ও গবেষণায় নতুন কিছুর উদ্ভাবন হয়। পাঁচ দশক আগের 'ডিজিস্ প্রোফাইল'-এর সঙ্গে এখন অনেক ফারাক। রোগ আলাদা, চিকিৎসা পদ্ধতি আলাদা। বদলে যাওয়া চিকিৎসা পদ্ধতিতে নিত্যনতুন প্রযুক্তির ব্যবহার—এ সবই আজকের দস্তুর।

ভারত, বাংলাদেশ, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—স্বদেশ বনাম বিদেশের ভৌগোলিক বিভেদ বিশ্বায়নের প্রভাবে আজ অনেক ফিকে হয়ে এসেছে। ফ্যাশন, খাওয়া-দাওয়া, বিনোদনে যেমন অন্য দেশ-সংস্কৃতিকে সহজেই আমরা আপন করে নিয়েছি, একইভাবে শিক্ষা, পেশা, যোগাযোগ, পরিষেবাক্ষেত্রেও আমরা কোনও সীমারেখায় আটকে নেই। প্রয়োজনমতো পরিষেবা, পণ্য নিচ্ছি, দিচ্ছিও।

কিছুকাল আগেও ধনী পরিবারের হাতে গোনা কয়েকজন উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত-বিভুঁই যেত। ডাক্তার, ব্যারিস্টার হয়ে ফিরত। এখন দ্বাদশের পর যে কেউ বিদেশে পড়তে যেতে পারে। বহু পড়বার বিষয় রয়েছে। শুধু স্বাস্থ্যক্ষেত্রকে ঘিরেই রয়েছে কত কী!

জেরিয়াট্রিক্স, জেনেটিক্স ও স্টেম সেল থেরাপি, মিনিমালি ইন্‌ভেসিভ্ সার্জারি, এন্ডোস্কোপিক ট্রিটমেন্ট, রোবোটিক সার্জারি, অ্যাডিকশন মেডিসিন, স্পোর্টস্ মেডিসিন, ডায়াবেটোলজি, ট্রান্সপ্ল্যান্ট সার্জারি, ট্রমা সার্জারি, নিউরোসাইকিয়াট্রি, অ্যাসিসটেড রিপ্রোডাকটিভ টেকনোলজি, ইমিউনোলজি, স্লিপ মেডিসিন। স্বাস্থ্য পরিষেবায় পরিকাঠামোর উন্নতি হওয়ায় সেইসঙ্গে যুক্ত বায়োটেকনোলজি, ক্লিনিকাল রিসার্চ, হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, হেলথ ইকোনমি, বায়োইনফরমেটিক্স ও মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশনের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। বিশ্ব জুড়ে অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে। এতদিন যে ফরেনসিক মেডিসিন নিয়ে তেমনভাবে, ব্যাপক হারে ভাবনাচিন্তা হয়নি, সেই ফরেনসিক মেডিসিনই এখন নতুন পেশার মধ্যে অন্যতম। তাই বদলে যাওয়া সমাজ ও তার চিকিৎসা-চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলাতে হয়েছে মেডিকেল শিক্ষার পাঠক্রম। এই ক্ষেত্রের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হল—জনসংযোগ দক্ষতা বা কমিউনিকেশন স্কিল। আজকের পরিষেবাসর্বস্ব সমাজ-ব্যবস্থায় যে কোনও ক্ষেত্রেই টিকে থাকতে গেলে প্রয়োজন দক্ষ জনসংযোগের। চিকিৎসকদের এই বিষয়ে সজাগ হতে হবে। এখন পেশা হিসেবে মেডিকেল 'ল' ও 'এথিক্স'-ও কম জনপ্রিয় নয়। শুধুমাত্র থিয়োরি মেনে পড়াশোনা নয়—শিক্ষান্তে একজন চিকিৎসককে স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো জরুরি ক্ষেত্র সামলাতে হয়। তাই ছাত্রাবস্থায় পরিষেবার মান, জনসংযোগ, পেশাদারিত্ব নিয়ে ভবিষ্যতের ডাক্তারদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা উচিত।

শুধু বিষয় নয়, পড়বার ক্ষেত্রেও অনেক সুযোগ বেড়েছে। বিভিন্ন দেশের মেডিকেল কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিদেশি পড়ুয়াদের জন্য রয়েছে বৃত্তির ব্যবস্থা। রয়েছে ছাড়ের সুযোগ। অনেক ব্যাংক পড়ুয়াদের সহজ শর্তে ঋণ দিতে রাজি।

আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রেই কাজের সুযোগ কম ও প্রার্থীর সংখ্যা বেশি। শিক্ষিত বেকার সমস্যা সমাজ ও সরকারের কাছে একটা বড় বাধা। সেখানে চিকিৎসাক্ষেত্রে দিনে দিনে কাজের সুযোগ বাড়ছে। নতুন নতুন হাসপাতাল, নার্সিংহোম যত গড়ে উঠছে ততই বাড়ছে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী ও অন্যান্য পেশাদারের চাহিদা।

আগে কোনও হাসপাতালের প্রশাসনিক ব্যবস্থাও দেখতেন ডাক্তাররাই। এখন বিদেশি মডেলে গড়ে ওঠা নার্সিংহোমগুলির পরিচালন ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রিধারীদের। অত্যাধুনিক হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্সদের মতো প্রথাগত পেশাদার ছাড়াও প্রয়োজন—ডায়াগনিস্টিক কর্মী, ফিজিওথেরাপিস্ট, অ্যানাসথিসিস্ট, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট থেকে হসপিটাল ম্যানেজার, ওয়ার্ড বয়, রিসেপশনিস্টদেরও। প্রত্যেকের নিজের নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োজনমাফিক প্রশিক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মেডিকেল দুনিয়া ঘিরে এরকমই কয়েকটি নতুন পেশার হদিস রইল এবারের কেরিয়ার বিভাগে।

মেডিকেল টেকনোলজি

এই যুগটা অটোমেশনের। কম্পিউটারের সঙ্গে অতি আধুনিক ইক্যুইপমেন্ট ঢুকে পড়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবাতেও। আর সেইসঙ্গে চাহিদা বাড়ছে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের। দেখা গেছে, এই ক্ষেত্রটিতে কাজের সুযোগ দেশের অন্যান্য কর্মক্ষেত্রগুলির তুলনায় অনেক বেশি। মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের দায়িত্ব হল গবেষণাগারে রোগ নির্ণয়। এর মধ্যে থাকতে পারে রক্ত থেকে বডি ফ্লুইড—যে কোনও কিছু সংক্রান্ত অ্যানালিটিক্যাল টেস্ট। এঁদের দেওয়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ল্যাবরেটরি ইনফরমেশন বা তথ্যের ওপরেই নির্ভর করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা চিকিৎসা করেন। সরকারি উদ্যোগে, প্রয়োজনের তাগিদে, শিক্ষিত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট তৈরির জন্য বেশ কয়েকটি টেকনিকাল ও প্যারামেডিকেল কোর্স ও কলেজ চালু হয়েছে এ রাজ্যেও।

কেন এই পেশায়

বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম, হেল্‌থ ক্লাব অথবা কমিউনিটি হেল্‌থ সেন্টার, সব জায়গাতেই দরকার মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের। তাই এগুলোর সংখ্যা যত বাড়ছে, বাড়ছে টেকনোলজিস্টদের প্রয়োজনও। এ ছাড়াও হাসপাতাল, কোনও ক্লিনিক অথবা ডাক্তারের চেম্বারের সঙ্গে যুক্ত ল্যাবরেটরি, সরকারি স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার, শিল্পসংস্থার সঙ্গে যুক্ত গবেষণাগার, সেল্‌স অথবা গ্রাহক পরিষেবায়ও এদের প্রয়োজন আছে।

ন্যূনতম যোগ্যতা ও কোর্স

এই পেশায় আসতে গেলে প্রফেশনাল সার্টিফিকেটের সঙ্গে চাই বায়োলজিকাল সায়েন্সে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সেইসঙ্গে যদি থাকে একটি হসপিটাল বা হেল্‌থ কেয়ার ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি, তাহলে তো কথাই নেই। তবে কাগজে কলমের ডিগ্রি বাদ দিলেও যে যোগ্যতা থাকতেই হবে তা হল—রোগীর সমস্যাটা বোঝার ক্ষমতা। একইসঙ্গে সাবলীল হতে হবে কম্পিউটারে। ভালোরকমের চেনাশোনা থাকা দরকার ল্যাব-ইক্যুইপমেন্টের সঙ্গেও। নজর হতে হবে তীক্ষ্ণ, যাতে সামান্যতম খুঁটিনাটিও চোখ এড়িয়ে না যায়। শেখার জন্য ট্রেনিং কোর্স রয়েছে প্রচুর। করা যেতে পারে এক বছরের ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্স। তবে সেক্ষেত্রেও কমপক্ষে থাকতে হবে বিজ্ঞানে উচ্চমাধ্যমিক মান বা বিএসসি। রয়েছে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স। বিএসসি-র পর এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স করা যায়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজ করতে গেলে এসব ছাড়াও একটা অতিরিক্ত লাইসেন্স বা রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন হয়।

একসঙ্গে অনেকগুলি যন্ত্র ব্যবহার করে বিভিন্ন রকম পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হয় চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত একজন প্রযুক্তিবিদকে। নমুনা পরীক্ষা করে সেটা বিশ্লেষণ করার পর ফলাফলটা তিনি জানিয়ে দেন ডাক্তারকে। এক্ষেত্রে কাজে লাগে অভিজ্ঞতা। পরীক্ষার ফলাফল যতটা সম্ভব যাতে ঠিক হয়, তার দিকে যথেষ্ট নজর রাখতে হয়। অনেক সময় ক্লিনিকাল ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানদের সুপারভাইজ করাও মেডিকাল টেকনোলজিস্টদের কাজের মধ্যে পড়ে। ছোট ছোট ল্যাবরেটরিগুলিতে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। বড় ল্যাবরেটরিগুলি সাধারণত বিশেষ ধরনের পরীক্ষা করা হয়। তাই সেসব ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদরাও হন বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। যেমন—মাইক্রোবায়োলজি টেকনোলজিস্টরা পরীক্ষা চালান ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য মাইক্রো-অর্গানিজ্‌মের খোঁজে। আবার ব্লাড ব্যাংকের কাজ হল রক্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষা। আর মলিকিউলার বায়োলজিস্টরা কাজ করেন কোষের কমপ্লেক্স প্রোটিন আর নিউক্লিক অ্যাসিড সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। সংস্থা ভেদে কাজ করার নিয়ম ও পদ্ধতি বদলে যায়। ল্যাবরেটরিতে যেহেতু অনেক রকম রাসায়নিক পদার্থ ও জীবাণু নিয়ে কাজ করতে হয়, তাই কাজটা বেশ ঝুঁকির। ক্লিনিকাল ল্যাবে টেকনোলজিস্টদের কাজের সময়সীমা নির্ভর করে সেখানকার সেট-আপের ওপর। বড় বড় হাসপাতাল বা নামি ল্যাবগুলি খোলা থাকে সপ্তাহে সাত দিন চব্বিশ ঘণ্টা। কখনও শিফটিং ডিউটি থাকে। ছোটোখাটো ল্যাবগুলিতে রোটেটিং শিফ্‌ট থাকে। তবে প্রয়োজনে পর পর রাত জেগে কাজ করার জন্যেও তৈরি থাকতে হয়। বছর দশেকের অভিজ্ঞতা থাকলে একজন প্রযুক্তিবিদ পেতে পারেন সুপারভাইজারের দায়িত্ব। পেতে পারেন ম্যানেজারের পোস্টও। ডায়াগ্নোস্টিক টেস্টিং কিট বা গবেষণাগারের যন্ত্র-সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী ও সরবরাহকারীরাও অভিজ্ঞ প্রযুক্তিবিদ খোঁজেন। তবে গবেষণাগারের ডিরেক্টর হতে গেলে থাকতে হবে ডক্টরেট ডিগ্রি। একজন মেডিকেল টেকনোলজিস্টের মাইনে নির্ভর করে তার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ওপর। তা ছাড়া প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের একটা নিজস্ব বেতন-কাঠামো থাকেই। মোটামুটি নামি সংস্থায় শুরুর বেতন ১৫ থেকে ২৫ হাজার টাকার মধ্যেই থাকে।

কোথায় পড়ানো হয়

➔ ক্রিশ্চান মেডিকেল কলেজ, ভেলোর ও লুধিয়ানা।

➔ গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ, ঔরঙ্গাবাদ, নাগপুর, অমৃতসর, পাটিয়ালা।

➔ লোকমান্য তিলক মিউনিসিপাল মেডিকেল কলেজ, সিওন, মুম্বই।

➔ জওহরলাল ইন্সটিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ, পুদুচেরি।

➔ ইউনিভার্সিটি অব কেরালা, মেডিকেল কলেজ।

➔ এআইআইএমএস, নিউ দিল্লি (মেডিকেল টেকনোলজিতে বিএস্‌সি ডিগ্রি, অপথ্যালমিক টেকনোলজিতে বিএস্‌সি)।

➔ কস্তুরবা মেডিকেল কলেজ, মণিপাল (নিউক্লিয়ার মেডিসিন টেকনোলজিতে বিএস্‌সি)।

হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট

চিকিৎসাক্ষেত্রের দুটি দিক। চিকিৎসা পরিষেবা—যেখানে ডাক্তার, নার্স, মেডিকেল টেকনোলজিস্টরা পরিশ্রম করেন, অপর দিকটি হল পরিকাঠামোগত ক্ষেত্র।

এই পরিকাঠামো পরিচালনার জন্য স্পেশালিটি হাসপাতাল, নার্সিংহোমগুলিতে হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রিধারীদের চাহিদা বাড়ছে।

ভবিষ্যতে হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়তে চাইলে দ্বাদশ স্তর থেকেই মন তৈরি করতে হবে। হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে স্নাতক স্তরে পড়তে চাইলে অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর দ্বাদশ স্তরে পাওয়া বাঞ্ছনীয়। বায়োলজি আবশ্যিক বিষয় হতে হবে। তবে এই বিষয়টি নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়তে চাইলে যে কোনও শাখায় স্নাতক হলেই হয়। শুধু মেডিকেল নয়, যে কোনও শাখার পড়ুয়ারাও হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট পড়তে পারেন। কোনও কোনও প্রতিষ্ঠানে এই বিষয়ে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স, এমনকি দূর শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। যেমন—দ্য ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব হেল্‌থ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর-এ আছে এক বছরের দূর শিক্ষার সুযোগ। আবার তামিলনাড়ুর মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হসপিটাল ও নার্সিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে দু-বছরের এমবিএ কোর্সের সুযোগ রয়েছে।

এই পেশায় সফল হতে গেলে শিক্ষাগত ডিগ্রি ছাড়াও কিছু ব্যক্তিগত বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। কঠোর পরিশ্রমের মানসিকতা থাকা চাই। তার থেকেও বড় কথা, হাসপাতালের মতো সেবামূলক পরিষেবাক্ষেত্রে কাজ করতে গেলে দক্ষ পেশাদার হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সহমর্মী মানুষও হতে হবে। চাই দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা। ভালো ব্যবহার, কাজের চাপ সামলাবার মতো মানসিক জোর, সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার সুঅভ্যাসও গড়ে তুলতে হবে। একইসঙ্গে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা থাকলে এই পেশায় সাফল্যের পথ সহজ হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পড়ার খরচ আলাদা। তপশিলি জাতি ও উপজাতির ছাত্রছাত্রীদের জন্য পড়ার খরচে ছাড়, বৃত্তি ও অর্থনৈতিক সাহায্যের ব্যবস্থা থাকে অনেক সময়। স্বাস্থ্যপরিষেবা ক্ষেত্রে কাজের চাপ কখনও তেমন কমে যায় না, তাই কর্মীর চাহিদাও বাড়তে থাকে। আমাদের দেশে এখনও এমন আড়াই লক্ষেরও বেশি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে দক্ষ হাসপাতাল প্রশাসক ও ম্যানেজারের প্রয়োজন।

কোথায় পড়ানো হয়

- এআইআইএমএস, নয়া দিল্লি।
- ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, কলকাতা।
- ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব হেল্‌থ ম্যানেজমেন্ট রিসার্চ, জয়পুর।
- আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ, পুণে।
- বিড়লা ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, পিলানি, রাজস্থান।❑

যোজনা ? কুইজ

১. ক্রিকেটের সর্বপ্রথম "বিশ্বকাপ টুর্নামেন্ট" কবে আয়োজিত হয়?

২. ১৯৭৫ সালের বিশ্বকাপের একটি ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পুরো ৬০ ওভারের ইনিংস-এ ব্যাটিং করে কোন ব্যাটসম্যান নট-আউট থেকে ৩৬ রান করেন?

৩. ১৯৮৩ সালে বিশ্বকাপে অভিষেকের পর ১৯৯২ সালের বিশ্বকাপে অন্য দেশের অধিনায়ক হয়ে মাঠে নামেন কে?

৪. পরপর ৪ বলে ৪ উইকেট নিয়ে কোন বোলার ২০০৭-এর বিশ্বকাপে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক নতুন নজির গড়েন?

৫. ভারত ২৫ জুন, ১৯৮৩-তে প্রথমবার বিশ্বকাপ জয় করে। ফাইনালে আম্পায়ার কারা ছিলেন?

৬. ১৯৮৩-র ফাইনাল ম্যাচে মাত্র একজন ব্যাটসম্যান শূন্য রান ('ডাক') করে আউট হন। তিনি কে?

৭. ১৯৮৭ সালের বিশ্বকাপের আয়োজন দুটি বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। কোন দুই 'নতুনত্বের' কথা এখানে বলা হচ্ছে?

৮. ১৯৭৫-এর বিশ্বকাপের প্রথম বলটি কে করেন?

৯. বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রানের পার্টনারশিপের শিরোপা বর্তমানে কোন জুটির দখলে?

১০. দক্ষিণ আফ্রিকার গ্যারি কার্স্টেন ১৯৯৬-এর বিশ্বকাপে রাওয়ালপিণ্ডিতে ১৮৮ রান (নট-আউট) করেন—এটাই এ পর্যন্ত বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর। কোন দেশ প্রতিপক্ষ ছিল?

১১. শচীন তেণ্ডুলকর ২২৭৮ রান করে বিশ্বকাপের মোট রানের তালিকায় সবচেয়ে উপরে। দ্বিতীয় স্থানে কে?

১২. নিউজিল্যান্ডের নেথান অ্যাস্টেল (১৯৯৬-২০০৩) এবং পাকিস্তানের ইজাজ আহমেদ (১৯৮৭-১৯৯৯) যৌথভাবে কোন রেকর্ডের অধিকারী?

১৩. ১৯৯৯-এর বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালের কী বৈশিষ্ট্য ছিল?

১৪. দশ উইকেটের ব্যবধানে সর্বপ্রথম কোন দল বিশ্বকাপের কোনও ম্যাচে জয়লাভ করে?

১৫. সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিশ্বকাপ ম্যাচ খেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার রিকি পন্টিং (১৯৯৬-২০১১-র মধ্যে মোট ৪৬টি ম্যাচ)। দ্বিতীয় স্থানে আছেন শচীন তেণ্ডুলকর (১৯৯২-২০১১-র মধ্যে ৪৫টি ম্যাচ)। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে কে আছেন?

[বি.দ্র. ২০১৫ সালের বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগের তথ্য ও পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করা।]

উত্তর :

১. ১৯৭৩ সালে। ইংল্যান্ডে। 'আন্তর্জাতিক এগারো' ও 'ইয়াং ইংল্যান্ড' সহ ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ত্রিনিদাদ ও টোব্যাগো এবং জামাইকার মহিলা ক্রিকেট দল অংশগ্রহণ করে। বিজয়ী ইংল্যান্ড। খেলা হয়েছিল 'রাউন্ড-রবিন' (লিগ) পদ্ধতিতে। পুরুষদের জন্য বিশ্বকাপের সূচনা হয় ইংল্যান্ডেই এর দু-বছর পর ১৯৭৫ সালে। ২. সুনীল গাভাসকার। ১৭৪ বলে। ৩. কেপলার ক্রিস্টোফেল ওয়েলেস। ১৯৮৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৯২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক হন। ৪. শ্রীলঙ্কার সেপারামাড়ু লসিথ মালিঙ্গা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এই রেকর্ড এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। ৫. এইচ ডি বার্ড এবং বি জে মায়ার। ভারতীয় দলের ১৮৩ রানের জবাবে লর্ডসে প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৪০ রানে আউট হয়ে যায়। ৬. ভারতের কীর্তি আজাদ। পুরো নাম—কীর্তিবর্ধন ভগবত ঝা আজাদ। স্যার অ্যান্ডি রবার্টস্-এর বলে (জোয়েল গার্নার-এর ক্যাচ) আউট হন। ৭. এক, প্রথমবার বিশ্বকাপ ইংল্যান্ডের বাইরে আয়োজিত হয় (ভারত ও পাকিস্তানে)। দুই, এক ইনিংসে ওভারের সংখ্যা ৬০ থেকে কমিয়ে ৫০ করা হয়। ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত প্রতিটি বিশ্বকাপ হয় ইংল্যান্ডের মাটিতে এবং প্রতিটি ইনিংস হত ৬০ ওভারের। ৮. ভারতের মদন লাল। লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ১৯৭৫ সালের ৭ জুন। ৯. সৌরভ গাঙ্গুলি ও রাহুল দ্রাবিড়। ১৯৯৯-এর বিশ্বকাপে টাঁটনে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৩১৮ রানের পার্টনারশিপ। ১০. সংযুক্ত আরব আমিরশাহি (ইউ এ ই)। ১১. অস্ট্রেলিয়ার রিকি পন্টিং। ১৭৪৩ রান করেছেন ৪৬ ম্যাচের ৪২ ইনিংসে। শচীন তেণ্ডুলকর ৪৫টি ম্যাচের ৪৪ ইনিংসে ব্যাট করেন। ১২. বিশ্বকাপে সবথেকে বেশি বার শূন্য রানে আউট হওয়ার তালিকায় এদের নাম শীর্ষস্থানে। বিশ্বকাপে এর পাঁচ বার "ডাক" করেছেন—অর্থাৎ কোনও রান না করেই আউট হয়ে গেছেন। দ্বিতীয় স্থানে চার বার শূন্য রানে আউট হয়ে আছেন ভারতের কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্ত সহ মোট পাঁচ জন। ১৩. বিশ্বকাপের ইতিহাসে এর আগে কোনও ম্যাচ 'টাই' হয়নি। অস্ট্রেলিয়ার ২১৩ রানের জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকাও ২১৩ রান করে। ১৪. ভারত। হারায় পূর্ব আফ্রিকাকে। ১৯৭৫ সালের বিশ্বকাপে। ৫৫.৩ ওভারে পূর্ব আফ্রিকার ১২০ রানের জবাবে ভারত ২৯.৫ ওভারে ১২৩ রান করে—সুনীল গাভাসকার (৬৫ রান) ও ফারুক ইঞ্জিনিয়ার (৫৪ রান) এবং অতিরিক্ত ৪ রান। ১৫. জাভাগল শ্রীনাথ। ১৯৯২ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে বিশ্বকাপে মোট ৩৪টি ম্যাচে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে ৪৪ উইকেট নিয়েছেন এই ফাস্ট বোলার।